পুরুষে অধিষ্ঠিত আতপস্বরূপ ব্রহ্মই প্রকৃতি সহকারে 'ঈশ্বর" নামে উক্ত হইতে পারেন। ভোগোপভোগ ও যোগসাধনের কর্ত্তারূপে ঐ পুরুষের জীবভাব যিনি ছায়াস্বরূপ, তিনিই "জীবাত্মারূপে" নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের উপকরণস্বরূপ প্রকৃতি হইতে উপরি উক্ত পুরুষের আতপস্বরূপ ভাগকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহাকেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ বাক্যমনের অগোচর "ব্রহ্ম" বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ পুরুষের প্রকৃতিজনিত ভোগরূপ বন্ধনযুক্ত যে জীবভাগ তাহা পুরুষপ্রকৃতির ভেদবিচার ও বাসনাক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ করে না। তাদৃশ উপায়ে মুক্তিলাভ করিলেই উপরি উক্ত প্রকৃতির অতীত এবং ঈশ্বরোপাধি হইতে মুক্ত "ব্রহ্মলাভ" হয়। সেই মুক্তিলাভ বা ব্রহ্মলাভ একই কথা। তাহারই নাম "কৈবল্য"। তখন ব্রহ্মভাগের ঈশ্বরত্ব ও জীবভাগের ব্যবহারিক জীবত্ব নষ্ট হইয়া ব্রহ্মভাগের কেবল নির্ম্মল ব্রহ্মত্ব এবং জীবের পক্ষে ঐ ব্রহ্মরূপ কৈবল্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। উক্ত প্রকার কোনভাগে প্রকৃতির সহকারিতা ও তজ্জনিত ভোগাদি না থাকায় সে অবস্থা কেবল স্বরূপাবস্থামাত্র। সেই জন্য তাহার নাম কৈবল্য।

এতাবতা মহর্ষি কপিলের মতে ঐ পুরুষের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর অসিদ্ধ। মহর্ষি পতঞ্জলি জীবের অন্তর্যামী উক্ত ব্রহ্মকেই সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি সম্বন্ধে "ঈশ্বর," এবং জীবের মুক্তিসম্বন্ধে "প্রত্যক্ ব্রহ্ম"রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব কপিলের দর্শনে যে পরমেশ্বর প্রচ্ছন্ন, পাতঞ্জলে তিনিই স্পষ্টীকৃত হইয়াছেন। অষ্টাঙ্গযোগসাধনের দ্বারা প্রকৃতির বন্ধনচ্ছেদ করিতে পারিলেই কৈবল্যরূপ মুক্তিলাভ হয়, ইহাই পতঞ্জলির সিদ্ধান্ত। প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞানই মুক্তি, ইহা কপিলের সিদ্ধান্ত। ইহা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, জৈমিনির 'পূর্ব্বমীমাংসা' যেমন বেদবিহিত "বিধি" অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী এবং ব্যাসের 'উত্তরমীমাংসা' যেমন বেদবিহিত "অনুভব" কি না জ্ঞান কাণ্ডের পক্ষপাতী, সেইরূপ পতঞ্জলি "অভ্যাসে সাধ্য" সাংখ্যযোগরূপ এক প্রকার কর্ম্মকাণ্ডেরই পক্ষপাতী আর কপিল সেইরূপ "অভ্যাস সাধ্য" সাংখ্যজ্ঞানরূপ একপ্রকার জ্ঞানকাণ্ডেরই পক্ষপাতী। কিন্তু বেদব্যাসের সিদ্ধান্তানুসারে হৃদয়ে ভগবৎভক্তি ও তদনুভব ব্যতীত বিধি, তর্ক ও অভ্যাস সকলই বন্ধনমাত্র। যাঁহাকে লাভ করিবার উদ্দেশে যাগযজ্ঞ,—যাঁহাকে লাভ করিবার উদ্দেশে পদার্থবিচার,—যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য,তপস্যা ও যোগাচর,—যাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রকৃতি ও মায়াভেদ,—তাঁহাকে যদি ভুলিলাম, তবে স্বর্ণ ফেলিয়া অঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করার ন্যায় কার্য্য হইল। বিধিবিহিত কর্ম্ম করিয়া অদৃষ্টের যোগে ফল পাইব, তর্ক করিয়া ক্রমে সিদ্ধান্ত লাভ করিব, যোগভ্যাস করিয়া শেষে কৈবল্য পাইব, মহর্ষি ব্যাস সেই ভাবি-ফলের আশারূপ অপার বন্ধন হইতে জীবকে উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মলোলুপ ঋষিগণের ব্রহ্মরূপ হস্তামলক ফল আনিয়া জীবের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। সেই অবধি সমস্ত ক্রিয়াকলাপের ফল ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়া আসিতেছে এবং যজমান সেই দূরস্থফলের বিনিময়ে ভগবানকে নিকটে পাইবার সম্বাধিকারী হইয়াছেন। ধন্য মহর্ষি ব্যাস!—যিনি নারায়ণের বংশে ভারতে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বযজ্ঞের অন্তিম ফল-

স্বরূপ নারায়ণকে ক্রিয়াসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখাইয়া গিয়াছেন। ধন্য সেই যজমান্!—যিনি সেই ব্রহ্মের উদ্দেশে ক্রিয়াসমস্ত আচরণপূর্ব্বক তাহার ফলসকল তাঁহাতে অর্পণ করেন।

এতাবতা এইক্ষণে আর নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মকাণ্ড নাই। যদি জ্ঞান জন্মে তবে কাহাকেও এখন নিরবচ্ছিন্ন বেদ-বিধির দাস হইতে হয় না। কেন না এখন সর্ব্বকর্ম্মপদ্ধতি-অনুসারে সকল ক্রিয়ার ফলই ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়া থাকে। তাহাতে যজমানের কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ যুগপৎ চরিতার্থ হইতে পারে। সুতরাং এখনকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকল আর কেবল বিধিপর কর্ম্মকাণ্ডশব্দের বাচ্য নহে। ব্যাসের প্রসাদাৎ তাহাকে ভক্তিকাণ্ড বলিলেই ঠিক হয়। এই ভক্তিকাণ্ড—প্রেমকাণ্ড—বা প্রীতিকাণ্ড ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যরূপ শাখা প্রশাখা এবং ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পুষ্পফলে সুশোভিত। এই প্রীতিকাণ্ডের মূলে জলসেচন করিলেই বুদ্ধিযোগরূপ সেই জ্ঞান লাভ হয় যদ্দ্বারা ক্রমেই প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

এতদূরে আমরা বেদের এবং বিধি, অনুভব, তর্ক ও অভ্যাসের পক্ষপাতী দর্শনসমূহের সমন্বয় করিলাম। এইক্ষণে ইহাও বলিতে ইচ্ছা করি যে, অষ্টাদশপুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, রামায়ণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রসকলও একমাত্র বেদেতেই সমন্বিত। মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও পরমারাধ্য সদাশিব দেখিলেন যে, বেদশাস্ত্রের জ্ঞানলাভে বা তদনুযায়ি-ক্রিয়াচরণে স্ত্রী, শূদ্র, ও পতিতদ্বিজগণের অধিকার নাই, এ নিমিত্ত তাঁহারা কৃপা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়ার্থ ঐ সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। বেদে ও সমস্ত দর্শনে যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই লোকের প্রভিন্ন অধিকারানুসারে ঐ সকল পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে অধিকার নাই, সাধারণতঃ তাঁহাদের সকলের নিমিত্ত কি ক্রিয়া, কি ব্রহ্মজ্ঞান এই উভয় অধিকারেই পুরাণ ও তন্ত্রাদিশাস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পুরাণপাঠ ও শ্রবনদ্বারা ইতিহাস, আখ্যান ও উদাহরণের ব্যপদেশে অধিকাংশতঃ ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা জ্ঞাত হওয়া যাইবে, আর তন্ত্রোক্তপদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রদীক্ষা ও ব্রহ্মেতে সমন্বিত নানা দেবতার পূজা হইবে। তদ্ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি ও ব্রহ্মজ্ঞানেরও অভাব নাই।

এইরূপ অধিকারানুসারে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রসকল একমাত্র বেদেতেই সমন্বিত। তন্ত্রোক্তদেবদেবী সমস্তই পৌরাণিক ও বৈদিক দেবদেবীমাত্র। তাঁহাদের নামে ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সমন্বয় করা কঠিন নহে। আমরা এস্থানে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। করিলে প্রস্তাব বাহুল্য হইবে। তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রভেদ, বৈদান্তিক পঞ্চকোষভেদ এবং সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব ও প্রকৃতিভেদ একই। তন্ত্রোক্ত আভিচারিকমন্ত্রসকল অথর্ব্ববেদের মন্ত্রমাত্র। কেবল বেদে অনধিকারী ব্যক্তিদিগের মঙ্গলকামনায় তৎসমূহ রূপান্তরে প্রচার করিয়াছেন। অতএব সকল শাস্ত্রই মান্য। অধিকারভেদে সকল শাস্ত্রেরই মঙ্গলোদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় ধর্ম্মের আকরস্থানই বেদ। তর্ক ও পরমাণু-বাদ, প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও যোগসাধন এবং ইতিহাস ও আখ্যান এ সমস্তই বেদের অন্তর্গত। বেদই সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর

ধর্ম্ম, ব্রহ্ম, যুক্তি, যোগ অর্থাৎ যথাক্রমে বিধি, অনুভব, তর্ক এবং অভ্যাসের অক্ষয়-ভাণ্ডার। যুগক্ষয়ে তাহার সজীবভাব বিনষ্ট হইলে, মহর্ষিরা ভিন্ন ভিন্ন অধিকারদৃষ্টিতে স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্রাদিতে তাহারই বিস্তার করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরমারাধ্য ভগবান্‌শিবোক্ত তন্ত্রমতে কলিযুগে মন্ত্রদীক্ষাদি হইবে, ইহাই ব্যবস্থা। লোকাচার সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণে কহিয়াছেন, "বেদোক্তেন বিধানেন আগমোক্তেন বা কলৌ। আত্মতৃপ্তঃ স্বধর্ম্মানি লোকযাত্রাং বিনির্ব্বহেৎ"। জ্ঞানিব্যক্তি সর্ব্বযুগে বেদোক্তবিধানে আর কলিযুগে বৈদোক্ত বা আগমোক্তবিধানে লোকাচার নির্ব্বাহ করিবেন। ফলতঃ আগমোক্তবিধান বেদবিরুদ্ধ নহে। শিব-বাক্য বেদবিরোধী হইতে পারে না। তন্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড বেদোক্ত ক্রিয়ারই রূপান্তর, তন্ত্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদোক্ত জ্ঞানকাণ্ডেরই ব্যাখ্যামাত্র। তাহার ভাষা অতি সরল, অলঙ্কারযুক্ত ও ভক্তি উত্তেজক। অতএব জ্ঞান, ভক্তি, ক্রিয়া, আচার, এ সমস্তই বেদের অবিরোধে তন্ত্রেতে দেদীপ্যমান। এবং কলিযুগের পক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ। কালসহকারে বেদের যে সকল ক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে, এবং বেদেতে যে সকল অনধিকার আছে, তন্ত্রশাস্ত্রসকল তাহাই পূরণ করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গবাসিগণ এবং ভারতের অন্যান্য অনেকস্থানের অনেকনিবাসী তন্ত্রমতেই দীক্ষিত। অতএব মহাদেব কৃপা করিয়া পরমাপ্রকৃতিস্বরূপিনী পার্ব্বতীকে উপলক্ষপূর্ব্বক যদি তন্ত্রশাস্ত্র না বলিতেন তবে ভারতের বড়ই দুরবস্থা হইত। তন্ত্রশাস্ত্র যেমন বেদের বিরোধী নহে, সেইরূপ পুরাণাদিরও বিরোধী নহে। কারণ তন্ত্রেতে যে দেবতার সম্মান, পুরাণাদিতে তাঁহারই নামগান। পুরাণমতে মন্ত্রদীক্ষার নিয়ম নাই। গায়ত্রী, সন্ধ্যা, বন্দনা, দশসংস্কার প্রভৃতি যেমন বেদমতে সম্পাদিত হয়, সেইরূপ অধিকারিভেদে গায়ত্রী, সন্ধ্যা, ইষ্টদেবতার পূজা, এবং কতিপয় ক্রিয়া তন্ত্রমতে আচরিত হইয়া থাকে। পুরাণশাস্ত্র এই সমস্তের প্রশংসায় এবং বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ডের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। পুরাণে সেই সমস্তই নানা উদাহরণ ও ইতিহাসদ্বারা বুঝাইয়াছেন। স্মৃতিতে সমস্ত বৈদিক যাগ, ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও যোগবাক্যসকলের মীমাংসা করিয়াছেন। অতএব সকল শাস্ত্রই একমাত্র বেদেতে সমন্বিত। যিনি উদারচিত্তে বলিতে পারিবেন যে, আমি সর্ব্বশাস্ত্রকে মানি,—পারক হই বা না হই—সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ-অনুযায়ী আচরণ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, তিনি আমাদের বিবেচনায় সমদর্শী ও যথার্থ সাধু। তিনি ভাবদ্ধর্ম্মকল্পবৃক্ষের কেবলমাত্র কাণ্ড, কেবলমাত্র শাখাবিশেষ বা কেবলমাত্র পুষ্পফলবিশেষের পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত সশাখা প্রশাখা, সপল্লব, সপুষ্প সমস্ত বৃক্ষের পক্ষপাতী! ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায় তাদৃশ দৃষ্টিতে সমস্ত শাস্ত্রই মানিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

পরলোক।

এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের সীমা কোথায়? সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্মক বিশ্বজনীন সংসারে সকল বস্তুরই প্রতিনিয়ত উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখিতেছি। এই উৎপত্তি ও ধ্বংসের সময়কেই আমরা বস্তুগত জীবনের আদি ও অন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করি। জড় ও ইতরপ্রাণীর এই আদি-অন্তের দিকে লক্ষ্য নাই, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জন্মিল, সাংসারিক নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রের গতিতে অহরহঃ ঘূর্ণিত বিঘূর্ণিত হইয়া, ইহারা স্বতঃই কালের অদৃশ্যগর্ভে বিলীন হইতেছে। কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানালঙ্কৃত, মনুষ্যের অনুসন্ধিৎসা সর্ব্বত্র বলবতী,—এই আদি অন্তের সূক্ষ্ম রহস্যের ভিতর প্রবেশ করিতে মনুষ্য অনুক্ষণ ব্যাকুল ও তৎপর।

আজি কত শত বৎসর হইল এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই দুরনুভবনীয় সময়ের মধ্যে কত শত প্রতিভাশালী ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী এই আদি-অন্তের সূক্ষ্মতত্ত্ব নিরাকরণার্থে জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, তথাপি ইহার গূঢ় তথ্য অদ্যাবধি কেহ স্থির করিতে পারেন নাই। 'ভিন্ন মুনির ভিন্ন মত';—তর্কের অবিশ্রান্ত তরঙ্গে বুদ্ধি ঢালিয়াও কেহ সমতল মীমাংসায় কূলে উঠিতে পারেন নাই।

আত্মার অবিনশ্বরতা সাধারণতঃ সকল মতাবলম্বী লোকেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আত্মা পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, যে কোন জীবাকারেই হউক, ইহসংসারে একবার মাত্র লীলা খেলা করিয়া আবার পরমাত্মায় লীন হইল, কিম্বা ইতর যোনীতে আরম্ভ করিয়া, ভূয়োভূয়ঃ জন্ম পরিগ্রহ দ্বারা ঐহিক অবস্থাপরম্পর্য্যে উন্নতি-অবনতির আবর্ত্তনে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া, চরমোৎকর্ষ লাভ করতঃ পরমব্রহ্মে বিলীন হইল—এই দুইয়ের সম্যক্ মীমাংসা সুদূরপরাহত।

মনুষ্য সকলকার্য্যেই কল্পনার সাহায্য লয়। কল্পনাই মনুষ্যের চিন্তা, গবেষণা, সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি সকলবিষয়ের অন্যতম ভিত্তি। কল্পনাবলেই কবির কবিত্ব, বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম। সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারসমাজের যত কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, সকলই মনুষ্যের স্বকপোলকল্পিত। বেদ বল, বেদান্ত বল, দর্শন বল, মীমাংসা বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল,—সর্ব্বলই মনুষ্যকল্পনার অন্যতম ফল। যত কেন মতভেদ হউক না, সে মতের আদিভিত্তি মনুষ্যের কল্পনা। ঈশ্বর সৃষ্টির সময় মনুষ্যের সঙ্গে কোন 'শাস্ত্র পুরাণ' পাঠান নাই, কেবল নানাবুদ্ধিপরিণী কল্পনাদেবীকে মনুষ্যের চিরসহচরী করিয়া দিয়াছেন। সেই কল্পনাবলেই শাস্ত্র, পুরাণ বিধি, ব্যবস্থা—সব। কল্পনাবলেই আত্মার অবিনশ্বরতা, কল্পনার সাহচর্য্যেই হিন্দুর পূর্ব্বলোক ইহলোক ও পরলোকে বিশ্বাস।

কিন্তু অনাদি, অনন্ত, অমেয়, অতলবিষয় লইয়া আমরা মস্তিষ্ক আলোড়িত করি কেন? এই সংসারই আমাদিগের ইহ জীবনের কার্য্য-

ক্ষেত্র। এই সংসারে আসিবার পূর্ব্বে কি ছিলাম জানি না, এই সংসার ত্যাগ করিবার পরে কি হইব জানি না। জীবনের প্রথম ও শেষ অবস্থা সকলের পক্ষে সমান, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর আর অন্নান্ন-লাভ-কাতর ভিক্ষুক উভয়েরই এক দশা। বালকের মনে যত দিন না ইহার বিশেষ জ্ঞান জন্মিল, যত দিন না তাহারা সুখদুঃখের তারতম্য বুঝিল, ততদিন উভয়ের চিত্তবৃত্তি একই রূপ,—কখন হাসিতেছে, কখন কাঁদিতেছে, আপন চিন্তাতে আপনিই বিভোর। আবার যখন অস্তিমদশায় দেহ শ্মশান-সৈকতে পর্য্যস্ত হইল, তখনও উভয়ের একদশা, উভয়েরই পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল। ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ ও সুগন্ধিদ্রব্যেই দেহের সৎকার কর, আর শৃগালকুক্কুরের ভোগ-তৃপ্তির নিমিত্ত অযত্নেই দেহপরিত্যাগ কর,—আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া শ্মশান-ঘাটের বাহ্যিকশোভাবর্দ্ধনই কর, আর সাধারণের দৃষ্টি বহির্ভূত নিবিড়-অরণ্যমধ্যে বিনা সৎকারেই দেহ বিসর্জ্জন দাও,মৃত্তিকা-বশেষ হওয়া ভিন্ন দেহের গত্যন্তর দেখি না। কিন্তু এ সংসারে এই দুইয়ের অতীত ঘটনা আর কিছুই দেখিতে পাই না। কোন যুগে কোন কালে কেহ কখন জাতিস্মর হইয়া আসিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনা যায়, সকলই আকাশকুসুম, সকলই কবি কল্পনার মোহিনী প্রতিভামাত্র।

যাহা আমরা দেখিতে পাই না, বিশ্বসৃষ্টির এই বিস্তীর্ণ কালের মধ্যে কেহ কখন দেখিয়াছেন এরূপ শুনিতে পাই না, তাহা আমাদিগের বিশ্বাস করার ফল কি?—ইহ-জীবনের কার্য্যপরিচালনের গতি স্থির করি-বার নিমিত্তই,বোধ হয়, পরলোকের কল্পনা। পরলোকে ইহলোকের কার্য্যকলাপের দোষ-গুণ বিচার ও অনুরূপ দণ্ডবিধান বা পুর স্কারের ব্যবস্থা না থাকিলে মনুষ্য সহজে সদসৎ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না বলিয়া, বোধ হয়, পুরাকালের মনীষাসম্পন্ন মুনিঋষিরা এই পরলোকের কল্পনা করিয়া-ছেন। পরজগতের যে কোন চিত্র দেখ, ইহজগতের কোন বস্তুর অতীত বিষয় কিছুই পাইবে না। নরকের ব্যবস্থা—উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপই বল, কীটানুকীট সমাকুল বহ্নিময় বিষ্ঠাকুণ্ডই বল, যাহা কিছু—সকলই ঐহিক ঘৃণার্হ ও ক্লেশদায়ক সামগ্রী ও বীভৎসভাব কল্পনার তুলিকায় অতিরঞ্জিত মাত্র। সেইরূপ স্বর্গেও—নন্দন-কানন, মলয়পবন, চন্দ্রকিরণ, কুসুম হিল্লোল, মেনকা-উর্ব্বশীর রসালাপ—সকলই ঐহিক সুখের কল্পনাপ্রসূত চরমসীমামাত্র। পর-লোকের বিচার প্রথাও ইহসংসারের বিচার-পদ্ধতির কল্পিত পূর্ণবিকাশমাত্র। যখন ইহ-জগতের সকল বস্তু লইয়াই পরলোকের কল্পনা, তখন ইহপরলোকের তারতম্যে প্রয়োজন কি? ইহজগতেই উৎপত্তি, ইহ-জগতেই স্থিতি, ইহজগতেই ধ্বংস, ইহজগ-তেই আত্মার কার্য্য, ইহজগৎ হইতেই আত্মার পরমাত্মায় বিলয়।

লোকে ইহজন্মের সুখদুঃখ পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করে। একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে ইহা ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। অনেককে দেখা গিয়াছে অতুলবিভবসম্পন্ন, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিলয়, ভাগ্যবান্‌পুরুষের সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও পরিণামে একমুষ্টি অন্নের জন্য কাতর হইয়া দুঃখকষ্টের পঙ্কিলহ্রদে নিমগ্ন হইয়াছেন;

আবার কেহ বা অতিদীনদুঃখীর গৃহে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া নিজের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তি, অতুল ধনসম্পত্তি রাখিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কেহ জীবনের প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া পরিশেষে স্বার্থপর কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন, আবার কেহ বা প্রথমে সকল প্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়া অন্তিমে সাধুমার্গানুযায়ী কার্য্য করিয়া আপনিও পরম সাধু বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ-পুণ্যের ফল স্বীকার করিতে গেলে প্রথমকে পাপী ও শেষোক্তকে পুণ্যাত্মা নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যদি পূর্ব্বজন্মে বহুল পুণ্যসঞ্চয়ই করিয়া থাকিবে, তবে ঈশ্বর তাহাকে পর জন্মের প্রথমেই একেবারে সুখের আলয়ে বা ধর্ম্মের আবাসভূমিতে পাঠাইলেন না কেন, এবং ইহজীবনে চিরদিন সেই সুখ বা ধর্ম্মভাব সমভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিলেন না কেন? পুণ্যের সঙ্গে যদি কিছু পাপের কালিমা পড়িয়া থাকে, তাহার ত পারলৌকিক শাস্তিতেই প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। যিনি ইচ্ছাময় তাহার এরূপ ইতরবিশেষিতা-পূর্ণ পক্ষপাতিত্বে ইচ্ছা কেন? এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐহিক চিত্তবৃত্তির স্ফুরণেই অবস্থার ও গুণের তারতম্য ঘটে,—পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্যের ফলানুসারে নহে। একই বীজ কোথাও কোন উর্ব্বরজমিতে কোথাও বা অনুর্ব্বর উপলভূমিতে, রোপিত হইল; জমির তারতম্যানুসারে বা সময়ের ইতরবিশেষিতায় একের বৃক্ষ সতেজ, অপরের নিস্তেজ হইল। কিন্তু হয় ত যত্নের গুণে বা সময়ের উৎকর্ষে সেই উপলভূমিতে কোন বৃক্ষের উন্নতি, আবার যত্নের অভাবে বা সময়ের দোষে উর্ব্বরজমির বৃক্ষ কোরকে কীটগ্রস্ত হইল। মনুষ্যজীবন সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ। প্রাকৃতিক নিয়মবলে একই পরমাত্মা প্রসূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মাকণা অসংখ্যভাবে ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন, সুখী, দুঃখী সকলেরই গৃহে যদৃচ্ছাক্রমে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জন্মবায়ুমধ্যে সকলেরই সমভাব, একই প্রক্রিয় বলে সকলে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিতেছে। অজ্ঞানাবস্থায় সকলেরই প্রকৃতি একরূপ। ক্রমে জ্ঞানের উন্মেষণে প্রত্যেকের চিত্তবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করিতেছে, কেহ জন্মগত জমি বা সময়ের দোষে চিরকাল সমান দুঃখে ও কষ্টে অতিবাহিত করিতেছে, কেহ বা নিজের কিম্বা পরকীয় যত্নগুণে তাহা হইতে কাটিয়া উঠিতেছে, সংসারে অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া যাইতেছে। আবার কেহ বা প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্যকৌশলে জল বুদ্বুদের মত উঠিয়াই বিলীন হইতেছে। চিত্তবৃত্তির তারতম্যানুসারে কেহ 'আনা-লওয়া খাওয়া দেওয়ায়' বিব্রত, কাহারও সামাজিক উন্নতি অবনতির দিকে লক্ষ্য, কেহ যুদ্ধবিগ্রহে লঘুহস্ত, কেহ পাশববৃত্তি পরবশ, আবার কেহবা ভীষণ অরণ্যে অথবা নির্জ্জন গিরিগুহায় ঈশ্বরানুসন্ধানকাতর। সকলেই প্রকৃতিগত জীবলীলা শেষ করিয়া রঙ্গভূমির অভিনেতার মত চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছে, আর ফিরিতেছে না।*

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, আত্মার ক্রমোন্নতি অপরিহার্য্য। যখন পৃথিবীস্থ সকল বস্তুরই ক্রমশঃ উন্নতি দেখিতে

*"Life's but a walking shadow! a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more!"

পাওয়া যায়, তখন আত্মার সেই উন্নতি থাকিবে না কেন?—আমরা বলি, এ তর্কও ভ্রমসঙ্কুল। যত কিছু উন্নতি সকলই ঐহিক, কালের পরিবর্ত্তনে কোন উর্ব্বরজমি মরু হইতেছে, কোন মরুভূমি শস্যপূর্ণা হইতেছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে দেশ যে, জাতি উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিয়াছিল, আজি কালের পরিবর্ত্তনে তাহা অবনতির অতল গর্ভে নিহিত। সেইরূপ যে জাতি অসভ্য ছিল সে সভ্য, যে মূর্খ ছিল সে পণ্ডিত, যে নির্ধন ছিল সে ধনী হইতেছে। কিন্তু এরূপ উন্নতি অবনতির পরিবর্ত্তন একটী দেশ কিম্বা একটী জাতির মধ্যে লক্ষিত হয়,—আত্মাময় জীবনের যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইল তাহার প্রমান কোথায়? যদি এক একটী ভিন্ন ভিন্ন আত্মার উন্নতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতের লোক মৃত্যুর পরে আত্মোন্নতিগুণে মিশরে জন্মিতেছে, মিশরের লোক ইংলণ্ডে জন্মিতেছে—এইরূপ। তবে ভারতের লোক ভারতে থাকিয়া আর আত্মার উন্নতির পরিচয় দিতে পারিল না। ইহাতেও ঈশ্বরের কার্য্য সীমাবদ্ধ বা পক্ষপাতপূর্ণ বোধ হয়, কিন্তু এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিলেও পাপ আছে। অধিকন্তু, আত্মা নৈসর্গিক পদার্থ,—ঐহিক ক্রমবিকাশ তাহার পক্ষে কোন মতে সম্ভবে না। আমরা তাই বলি যে, ইহা আত্মার ক্রমোন্নতির পরিচয় নহে প্রত্যুত, পরমাত্মাপ্রসূত নব নব আত্মাকণা যদৃচ্ছাক্রমে যত্র তত্র জীবলীলা করিতেছে, এবং দেশ, কাল ও আকরভেদে যে উন্নতি-অবনতির চিহ্ন দেখাইতেছে তাহা বাস্তবিক আত্মার উন্নতি নহে।

সৃষ্টির প্রথমে যত মনুষ্য ছিল, আজি তদপেক্ষা কত অধিক হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ সাময়িক লোকসংখ্যার হিসাবদর্শনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা যায় না। যখন মনুষ্যসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধি, তখন অন্যান্য ইতরপ্রাণীর, এমন কি জড়-পদার্থ সমূহেরও, সংখ্যা যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পদার্থবাদিদিগের মতে সৃষ্টির প্রথমেও যে পরিমাণে পদার্থ ছিল, আজি পর্য্যন্ত তাহাই আছে, কিছুমাত্র হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে নাই; সুতরাং এক প্রাণীর অভ্যুত্থান, অপরের পতন, চেতনের বৃদ্ধি, জড়ের ক্ষয় অনিবার্য্য। এ প্রকার সিদ্ধান্তেও ভগবানের কার্য্যের অসীমত্বে ব্যাঘাত জন্মে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাক্রমে যে ভূরি ভূরি চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টি নিমেষমধ্যে হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ উত্থাপনে ফল কি? অতএব, আত্মার ক্রমোন্নতিগুণে যে পদার্থগত বা প্রাণিগত উন্নতি হইবে না, ইহা একরূপ মীমাংসিত।

অনেকে বলিতে পারেন যে, যদি ঐহিক কার্য্যপরম্পরাগুণে আত্মার উন্নতি-অবনতিই না হইল, তবে পাপ-পুণ্যকল্পনার প্রয়োজন কি? আমরা বলি, পাপ পুণ্য কল্পনার সামগ্রী নহে, প্রকৃতিগত চিন্তার ফল। সামাজিক আচারব্যবহারগত অপকৃষ্টতা বা উৎকৃষ্টতাকে পাপ পুণ্য বলা যায় না। বিবেকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে যাহা কুৎসিৎ, তাহাই পাপ,—যাহা পবিত্র ও আনন্দজনক, তাহাই পুণ্য। ইহাও ঐহিক চিত্তবৃত্তির তারতম্য ও শিক্ষাবিধানের গুণাগুণ অনুসারে অনুমিত হয়। যে জন্মিয়া অবধি অসভ্যসমাজে বেড়াইয়াছে, আমমাংসভক্ষণে দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, অসৎসঙ্গে সর্ব্বদা লিপ্ত রহিয়াছে, পরস্বাপহরণ যাহার কার্য্যের মূলমন্ত্র, জননী শিক্ষাদেবীর সঙ্গে যাহার আজন্ম বিবাদ,

তাহার মনে কখন পুণ্যের ছায়া পড়িতে পারে না, তাহার স্বকৃতকার্য্যের অপকৃষ্টতা বা দোষ সে অনুভব করিতে পারে না, পাপ-পুণ্যের পার্থক্য সে বুঝিতে পারে না। কিন্তু যে আজীবন সৎসমাজে পোষিত, সৎশিক্ষায় লালিত,—নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, বুভুক্ষুর ক্ষুধাশান্তি, দরিদ্রের অভাবমোচন প্রভৃতি কার্য্যে তাহার মন স্বভাবতঃই উৎফুল্ল হয়, কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহার মনোমধ্যে স্থান পায়। তাহার অন্তরে পাপের কালিমা পড়িলে সে জ্ঞানশূন্য হয়, অনুতাপের সহস্র বৃশ্চিক তাহার হৃদয়কে দংশন করিতে থাকে। সভ্যসমাজে এই দুঃখসুখ বিধায়ক কার্য্যের অন্যতম নাম পাপপুণ্য। ইহা কাহাকেও কল্পনা করিয়া লইতে হয় না, জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার পার্থক্য মনে স্বতঃই অনুমিত হয়। ইহসংসার ঈশ্বরের অনন্ত মহিমাপ্রকাশক লীলাভূমি, এ সংসারের উন্নতি, সুতরাং, তাঁহার নিতান্ত বাঞ্ছিত। যখন সেই পরমাত্মাপ্রসাদে ইহ সংসার দেখা গিয়াছে, এবং সভ্যসমাজে জন্মগ্রহণ করায় সদসৎকার্য্যের পার্থক্য জ্ঞান হইয়াছে, তখন সাধ্যমত সৎকার্য্যের দ্বারা সংসারের উন্নতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই জন্যই পাপ-পুণ্যের চিন্তা; ইহ-পর-লৌকিক গতিবিধি বা আত্মার ক্রমবিকাশের চিহ্নজ্ঞাপনের জন্য নহে।

এতদ্দ্বারা সংক্ষেপতঃ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, পরমাত্মাপ্রসূত অসংখ্য আত্মকণা যদৃচ্ছাক্রমে ইহসংসারে বিস্তীর্ণ হইয়া অত্যল্পকালের জন্য প্রতিনিয়ত আপন আপন কার্য্য করতঃ আবার সেই পরমাত্মায় চিরদিনের জন্য বিলীন হইতেছে, এরূপ চিন্তা করিলে যুক্তির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ঘটে না। পরন্তু যখন পারলৌকিক রহস্যদ্বার অদ্যাপি কেহ উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই, তখন ঐরূপ চিন্তাই কতক যুক্তির অনুমোদিত। তবে ইহা সিদ্ধান্ত নহে, কল্পনার সামান্য আভাসমাত্র।

অবশেষে যদি কেহ এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি আত্মার ক্রমোন্নতিনাই, তবে অতি অল্পকালের জন্য পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারে আসিবার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে এ প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব নহে। কিন্তু আত্মাগুলি অর্থাৎ পরমাত্মার অংশগুলি যে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া জীবলীলা সম্পন্ন করিয়া আবার সেই পরমাত্মায় লীন হয় না, এমন কি প্রমাণ আছে? আর এক কথা এই যে, ঈশ্বরের কল্পিতগুণগুলি যে কল্পনাপ্রসূত ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা বিস্তর প্রমাণ সহিত প্রদর্শিত হইতে পারে। ঈশ্বরের অর্থ আমরা এই জানি যে ইহা এক অব্যক্ত-অনন্ত শক্তির সম্পূর্ণতা। অপর যে খণ্ডশক্তি দেখা যায় তাহা ঐ সম্পূর্ণ শক্তির অংশ মাত্র—কখন পৃথক্ কখন বা মিলিত হইতেছে। শ্রীপাঁ—

কার্ দেবী পূজ তুমি ?—
কোন্ অধিকারে ?

অতীত—ভবিষ্য—দুই সুখীর ধ'রণা ;
প্রতিবাক্য উহাদের—বিস্মৃতি,—কামনা।
বিস্মৃতি—স্মৃতির খনি, কামনা—প্রয়াশ,
একে-"ছিল," অন্যে "-হবে"-উভয়ি-বিশ্বাস
এ বিশ্বাস—আত্মামনে অটুট বন্ধন।
এ বিশ্বাস—জীবনের নিগূঢ় জীবন।
"ছিলনা" জীবনে যার—কিম্বা নাহি "হবে"
এ বিশ্বাস তার প্রাণে, কেমনে সম্ভবে।
"ছিলনা"—"হবে না" যদি,—তবে অকারণ,
অতীত—ভবিষ্যে—আজ কেন অন্বেষণ ?
নাহি জানি —পারি নাই আপনি বুঝিতে,
বুঝি কিন্তু—বর্ত্তমান না পারি সহিতে।
নাহি ছিল যাহা—তাও ইহায় নিরখি,
হইবে না কভু যাহা—তাও ইথে দেখি।
সুধু নাহি দেখি—ইহা নহেক কল্পনা,
তীব্র স্পর্শ তার প্রাণে বাজে সর্ব্বক্ষণ।
নিবিষ্ট গভীরকার্য্যে—সহসা মানসে,
এই ছায়া অন্তস্থল উথলিয়া ভাসে।
বিশ্রামে অলস মন—উদাস নয়ন—
এই ছায়া প্রাণ ব্যাপি করে সঞ্চরণ।
নিদ্রায় নিশ্চল জ্ঞান—প্রাণ অচেতন,
এই ছায়া মর্ম্মে করে স্পর্শ বরিষণ।
ছায়া যার—কল্পিত নয়—প্রকৃত সেজন,
ছিল না—হবে না কিন্তু আমার কখন।
তথাপি ধারনা এই সদা বিদ্যমান,
অতীত ভবিষ্য প্রাণে নাহি পায় স্থান।
সুধু বর্ত্তমান—সুধু প্রবাহ ছায়ার—
বহিছে জীবননদী প্লাবিয়া আমার।
তাই ভাবি—সে বিশ্বাস আমার জীবনে
অসম্ভব ?—কিম্বা তাহা সম্ভব কেমনে ?
আমার সে ?—না না, সে যে নহেরে আমার,
ভাবিতেও ইহা মোর নাহি অধিকার।
হবে সে আমার ?—অহো নিষ্ঠুর ভাবনা !
কোন্ দোষে তাঁর এই অনিষ্ট কামনা ?
জঘন্য স্বার্থের আশা—হেন আকিঞ্চন
পবিত্রহৃদয়ে স্থান দিবনা কখন।
সুখে আছে, সুখে থাক্ ; ডাকিব ঈশ্বরে,
সুখ তাঁর বহে যেন চিরদিন তরে।
কিন্তু তত্তোধিক সুখী করিবারে তায়
আমার অসম্ভব কেন এত সাধ যায় ?
ভূতলে রাখিয়া তারে তৃপ্তি নাহি পাই !
ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার স্থান খুঁজিয়া বেড়াই,
কোমল মধুর স্থান যথায় পেয়েছি,
সেই খানে ছায়া তাঁর মাথা'যে রেখেছি।
তবু লভি নাই তৃপ্তি ;—তবু অনুমান,
জগতে নাহিক তাঁর তুলনীয় স্থান।
তাই সে প্রাণের মম পবিত্র মন্দিরে
রাখিয়াছি ছায়া তাঁর এত যত্ন করে।
দেবতার দেবী ভাবি পূজিতেছি তাঁয়,
সঁপিয়াছি পাদপদ্মে প্রাণমনকায়।
অর্চ্চনার উপাদান যেখানে যা পাই,
নমস্তস্মৈ বলি পদমূলে রাখি তাই।
বর্ত্তমান কহে আজ নির্দ্দয় আচারে,—
কার্ দেবী পূজ তুমি ?—কোন্ অধিকারে ?

হুগ্‌লী। ঈশান।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ।

[এই পত্রের 'মাস সমালোচন' ও 'সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হয়, অতএব বিষয়বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।]

১। কলিকাতার মহামেলাপ্রসূত অপবাপর সুফলের মধ্যে, শুনিতেছি, আমাদের দেশের ভদ্রপরিবারস্থ মহিলারা যে সহস্রে সহস্রে মেলা সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তজ্জন্য সমাজের অনেক উন্নতি সাধিত হইবে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবরোধপ্রথা অবশ্য আজকাল অনেকেরই অনুমোদিত নহে, তবে বহুকালের প্রথা একদিনে নির্ম্মূল হইতে পারে না। হঠাৎ ইহার পরিবর্ত্তন করিতে যাইলে নানা প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা; এই জন্যই, অনেক লোকে ইচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রথার অবমাননা করিতে পারেন না। এমন অবস্থায়, আমাদের চিরাবরুদ্ধা অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকেরা যে অবাধে এবং নিন্দনীয়া না হইয়া কতকটা প্রকাশ্যভাবে মেলাসন্দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য আমরা সুখী হইয়াছি, এবং তাঁহাদের স্বাধীনতাস্ফূর্ত্তির এই প্রথম লক্ষণ দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্যও অনেক আশা করিতে পারি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের একটী কথা আছে। আমাদের বাঙ্গালাদেশের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ অতিশয় মন্দ ও অপ্রচুর। যদি পরিবারদিগকে সাধারণ্যে বাহির করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের পরিচ্ছদ ভাল করা উচিত। একখানি দশহস্তপরিমিত শাটীমাত্র আমাদের স্ত্রীলোকদিগের সমস্ত পরিচ্ছদের কার্য্য সম্পাদন করে। পূর্ব্বে এই দশহস্তশাটীতে কিয়ৎপরিমাণে অঙ্গের সৌষ্ঠব এবং সম্মান রক্ষিত হইত বটে, কিন্তু তখন আজকালের মত এত চিক্কণবস্ত্র সদা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত না। এতদ্ভিন্ন সেকালে আমাদের পুরাতন হিন্দুসমাজের শাসনও এত কঠোর ছিল যে, তখন স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক নম্রতা একালের অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল, সুতরাং কখন কখন ভাল পাতলা কাপড় ব্যবহৃত হইলেও তাহাতে লজ্জাশীলতার বিশেষ ব্যাঘাত হইত না। কিন্তু সমাজের সেই পুরাতন শাসন ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে এবং কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়েই একটু একটু নূতন স্বাধীনতার ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছেন। এখন ভাবভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে; রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এবং তৎসঙ্গে নানাবিধ সুদৃশ্য ও সুচিক্কণ বস্ত্রালঙ্কার দেখা দিতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, আজকাল আমাদের পরিবারদিগের পরিচ্ছদ দেখিলে আমাদিগকে নিজে নিজেই লজ্জিত হইতে হয়। স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হউন, স্বাবলম্বী হউন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, তবে তাঁহাদের পরিচ্ছদ যাহাতে সুসভ্য এবং সুরুচিসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে পশ্চিমাঞ্চল খুব ভাল, তথাকার স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ উপযুক্ত ও প্রচুর; এমন কি, আমরা

বলি, সুসভ্য ইয়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষাও অনেক শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমবাসিনী স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইলে পুরুষের লজ্জাবোধ করিতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি পশ্চিম হইতে কখন বাঙ্গালায় আসিয়াছেন, তিনি বেশ বুঝিতে পারেন যে, পশ্চিমের সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালায় পঁহুছিলে পথিমধ্যে বাঙ্গালি-স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়া হঠাৎ মনের মধ্যে কিরূপ লজ্জা,বিরক্তি এবং ঘৃণার উদয় হয়। অর্দ্ধবসনা—অর্দ্ধ উলঙ্গিনী—অর্দ্ধাবৃতা -কত শত স্ত্রীলোক সারি সারি রাস্তা দিয়া চলিতেছে। লজ্জা নাই, মনে একটু দ্বিধা নাই; বেশ হাত দোলাইয়া, অঙ্গ হেলাইয়া, অলঙ্কার দেখাইয়া সারি সারি চলিতেছে! লজ্জা করিবে কেন? আমরা নিজে তাহাদিগকে এই বেশে সজ্জিত করিয়াছি, তাহাদের অপরাধ কি?

ভরসা করি আমাদের পাঠকেরা এই বিষয়টী বিবেচনা করিবেন, এবং যাহাতে এই কদর্য্য প্রথা অনতিবিলম্বে আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হইয়া যায়, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

আমাদের মতে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, মহারাষ্ট্রদেশে, কিম্বা বোম্বাইয়ের পারসীস্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যেরূপ পরিচ্ছদের ব্যবহার আছে, বাঙ্গালায় তাহাই হওয়া উচিত।

২। পাতলা কাপড়ের যেমন বাড়াবাড়ী, তেমনি আজ কাল আমাদের দেশে গহনারও অত্যন্ত প্রাবল্য। গত ১০। ১৫ বৎসর মধ্যে যে কত রকমের গহনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যেমন একদিকে গহনার রকম বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি অপরদিকে স্ত্রী গত-প্রাণ মনীজী বিবাঙ্গালিবাবুদেরও প্রাণান্ত হইতেছে। ঘর নাই, বাড়ী নাই; সুখে স্বচ্ছন্দে হয়ত দুই বেলা আহারের যোগাড় হয় না; অতি কষ্টসৃষ্টে কোন প্রকারে হয়ত মান, সম্ভ্রম, লোক, লৌকতা রক্ষিত হয়, কিন্তু এদিকে স্ত্রীর গহনা চাই। 'দশখানা' না হইলে চলিবে কি প্রকারে? লোকে বলিবে কি? নিমন্ত্রণ খাইতে যাইলে আদর হইবে কেন? এইরূপ অশেষপ্রকার তর্ক প্রত্যহ প্রত্যেক হিন্দুপরিবারে উত্থিত হইতেছে, এবং তাহার ফলে দেশের মধ্যে গহনারও ছড়াছড়ি হইতেছে।

বাস্তবিকই, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদির উপর, সুধু বাঙ্গালী কেন, সমগ্র ভারতবাসিদিগেরই অত্যন্ত ঝোঁক। নানাবিধ অলঙ্কারের ব্যবহার ভারতবর্ষে যেমন বেশী, এমন আর পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই নাই। কিন্তু ইয়ুরোপীয়দিগের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত পার্থক্য। একজন ইয়ুরোপীয়ের গৃহ পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিবে, তাঁহার স্ত্রী-কন্যার গাত্রে একখানিও অলঙ্কার নাই; কিন্তু অপর দিকে সমস্ত গৃহ, বস্ত্র, তৈজস, চেয়ার, টেবিল, কাঁচ, ঘড়ী, পুস্তক, সম্বাদপত্র, ইত্যাদি শতসহস্র প্রকার দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমরা ভাবি যে, ইঁহারা কি নির্ব্বুদ্ধি, কেবল কতকগুলা ক্ষণধ্বংশী কাপড়চোপড় এবং কাঁচের বাসনে ঘর ভরিয়া রাখিয়াছেন। কতদিনই বা এ সমস্ত জিনিষ থাকিবে, এবং বেচিলেই বা ইঁহাদের মূল্য কি হইবে? যে টাকায় তাঁহারা এসকল ক্রয় করেন, আমরা তাহা দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া লই। স্বর্ণরৌপ্য বহুমূল্য দ্রব্য এবং বহুকালস্থায়ী; পিতার মৃত্যুর পর পুত্র পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিতে পারে; এবং

অর্থের প্রয়োজন হইলে, কিম্বা অসময় উপস্থিত হইলে, ইহার বিনিময়ে তৎক্ষণাৎ অনেক টাকাও পাইতে পারে। কিন্তু ইহার ভিতর একটি গূঢ় কথা আছে আমরা 'অর্থ" কিম্বা "ধন" এই কথা বলিলেই তাহার অর্থে টাকা, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণিমুক্তার স্তূপ বুঝিয়া লই। কিন্তু ইয়ুরোপে ইহার অর্থ অন্য প্রকার। ব্যবহারীয় দ্রব্যাদির সমষ্টিকেই ইয়ুরোপীয়েরা "ধন" বলিয়া বুঝেন। তাহাদের মত এই যে, যতই এই ব্যবহারীয় দ্রব্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে ততই জাতীয় ধনের বৃদ্ধি হইবে, এবং তৎসঙ্গে সমাজেরও উন্নতি এবং সুখস্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইবে। তুমি সহস্র মুদ্রায় দশখানি অলঙ্কার প্রস্তুত করাইলে, তাহা করিলে কেবল এক শ্রেণীর কারিকর মাত্র (স্বর্ণকার) জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইল, কিন্তু একজন ইয়ুরোপীয় সেই সহস্রমুদ্রা দিয়া শত প্রকার ব্যবহারের দ্রব্য প্রস্তুত করাইলেন, এবং সেই সমস্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইলে শত শ্রেণীর শ্রমজীবি লোক প্রতিপালিত হইল। এই এক উপকার, দ্বিতীয় উপকার এই যে, এই ব্যবহারীয় দ্রব্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, তাহার ফলে জাতীয় ধনেরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মনে কর, এক টুকরা পিত্তলের মূল্য কি? অতি সামান্য মাত্র। কিন্তু সেই পিত্তলটুকু দিয়া একটী "চব্‌স্‌ প্যাটেণ্ট" কুলুপ তৈয়ারি হউক, তখনই তাহার মূল্য বিংশতিমুদ্রা হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, স্বভাবজ পদার্থনিচয়কে মনুষ্য যত নিজ বুদ্ধি এবং পরিশ্রম দ্বারা অবস্থান্তর করিয়া তদ্দ্বারা সমাজের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি তৈয়ার করিতে পারিবে, তত তাহা হইতে অর্থাগম হইবে, এবং তাহার ফলে সমাজের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইবে। আমরা কেবল কতকগুলি স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার করিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া দিই, দেশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী টাকা অলঙ্কার রূপে, কিন্তেও আমাদের চিরদরিদ্রতা ঘুচে না। ইয়ুরোপীয়েরা কেবল কতকগুলি স্বল্পমূল্য স্থায়ী কাঁচের বাসন, কাপড়ের পোষাক, এবং কাঠকাঠরা সংগ্রহ করিয়াও প্রভূত ঐশ্বর্য্য এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। এই সমস্ত অতিপ্রয়োজনীয় কথা বুঝিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা আমাদিগের পুরাতন কুসংস্কারসমষ্টি বিদূরিত করিতে পারিব, ততদিন কিছুতেই যে আমাদের উপস্থিত দুঃখ এবং কষ্ট ঘুচিবে না, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

৩। ইংরাজি সভ্যতা এবং শিক্ষার অপরিহার্য্য উত্তেজনায় গত কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গসমাজমধ্যে একটু সজীবভাব আবির্ভূত হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এখনও আমাদের চিরাভ্যস্ত আলস্য এবং উদাসীনতা দেখিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইতে হয় বটে, কিন্তু সমগ্র সমাজের ভাবগতিক দেখিলে বোধ হয় যেন আমাদের চিরনিদ্রাভঙ্গের উপক্রম হইতেছে। ঘোর তমসার মধ্যে এক্ষণে এক একটু বিদ্যুচ্চমক নয়নগোচর হয়, এবং অসীম নিরাশার মধ্যে এক্ষণে একটু একটু আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু এক্ষণ আমাদের পরিবর্ত্তনের অবস্থা, আমরা দুইটী পরস্পর বিপরীত অবস্থার সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এ সময়ে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত; কেন না এখন আমরা যেরূপ ভাবে আপনাদিগকে চালিত করিব,

এখন আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বভাব যেরূপ ভাবে গঠিত হইবে, তাহারই ভালমন্দের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিবে। আমাদের আজকালের কার্য্যকলাপ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন আমরা জাতীয় ধন এবং তৎসাপেক্ষ সকল প্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিবার চেষ্টা একবারেই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র উদ্দেশ্যবিহীন ভিত্তিশূন্য রাজনীতির আলোচনাতেই ব্যাপৃত হইতে আরম্ভ করিতেছি। ইহার কারণ আছে, আমরা যেরূপ ভাবে রাজনীতির আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে না শরীরের পরিশ্রম না অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয়, কিন্তু অপর পক্ষে সমাজমধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে এত নূতন রকমের কথার চালাচালি হয়, যে তদ্দ্বারাই, আমাদের হৃদয়মধ্যে নূতন শিক্ষা-প্রভাবে যে একটু উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার যথোচিত শান্তি সম্পাদিত হইয়া থাকে। আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যাই, এবং তাহাতেই আমাদের সকলপ্রকার ক্ষোভের নিবৃত্তি হইয়া যায়। খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে অশেষ ধনসম্পত্তির অধিকারী রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত সকলেরই একভাব ; সকলেই "হুজুক" লইয়া ব্যস্ত, সকলেই "বাতাসে ফাঁদ পাতিয়া" হো হো করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! এরূপ রাজনৈতিক আন্দোলনে যে কোন উপকারই নাই, কিম্বা হইতে পারে না, তাহা আমরা বলি না; কিন্তু তথাপি "সর্ব্ব-মত্যন্ত গর্হিতম্!" আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে, পুরাতন বন্দোবস্ত আর আমাদের কিছুই থাকিবে না, যে ভাবে পিতাপিতামহ অযত্নসম্ভূত অনায়াসলভ্য সামান্য শাকান্নে পরিতুষ্ট হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা করিবার আর আমাদের যো নাই। বিলাতি সভ্যতার "বেনো" জল ঢুকিয়া আমাদের পুরাতন 'পুঁজিপাটা' যাহা কিছু ছিল, সে সমস্তকেই তাড়িত বিতাড়িত এবং অবশেষে নিষ্কাসিত করিয়াছে। ঘরে অন্ন নাই; গৃহে আবরণ নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই; বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী, চারিদিকে হাহাকার শব্দ,—এমন অবস্থায় কি শুধু রাজনীতির আন্দোলন করিলে আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে? আমাদিগের জাতীয় সম্মান, স্বত্ব এবং স্বাধীনাত্বরক্ষার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি, সে খুব প্রশংসার কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে উদরান্নের যাহাতে যোগাড় হয়, দেশের দারিদ্র্য যাহাতে বিদূরিত হয়, তাহার চেষ্টা করাও কি উচিত নহে? ইংরাজদিগের উচ্চদরের রাজনৈতিক আন্দোলন দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়া যাই; তাঁহাদের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া আমরাও সেইরূপ করিব বলিয়া অগ্রসর হই, কিন্তু ইহা আমরা একবার ভাবিয়াও দেখি না যে, কতকাল হইতে দৈহিক পরিশ্রম করিয়া, কত প্রকার কার্য্য করিয়া, কত ব্যবসায়বাণিজ্য করিয়া, কত কৃষি এবং শিল্প অভ্যাস করিয়া, তবে আজকাল ইংরাজেরা তাঁহাদের উপস্থিত জগৎবিস্ময়কারী আশ্চর্য্য উন্নতির অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন। একদিনে হয় নাই, এক বৎসরে হয় নাই, একযুগে হয় নাই, এবং এক শতাব্দীতেও হয় নাই, শত শত বৎসর পরিশ্রম, চেষ্টা, একাগ্রতা, সাহস এবং সহিষ্ণুতা করিতে এবং দেখাইতে হইয়াছে, তবে এতদূর ফললাভ হইয়াছে। কিন্তু এ

সমস্ত কথা আদৌ আমাদের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। ব্যবসায়-বাণিজ্য-কৃষি-শিল্প—এ সমস্তের উপর আমাদের একবারেই কোন প্রকার আসক্তি নাই। আমরা "হুজুকে" জাতি, সুধু কথার "হুজুক" পাইলেই আমরা মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকি। কিন্তু একথা আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের এইরূপ মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইবে, "হাওয়া" ছাড়িয়া যতদিন না আমরা আসল কার্য্যে মনোনিবেশ করিব ততদিন আমরা আমাদিগের উপস্থিত অবস্থার কোন উন্নতিই করিতে পারিব না, কেবলমাত্র সমস্ত সভ্যজগতের বিদ্রূপ-ভাজন হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকিব।

৪। একতঃ ব্যবসায়বাণিজ্যে আমরা চিরকাল হইতে অনভ্যস্ত, তাহাতে যদিও কখন কখন ব্যক্তি কিম্বা সম্প্রদায়বিশেষের দ্বারা কিছু কিছু চেষ্টা হয়, তাহারও কোন ফলোৎপত্তি হয় না। আমাদের কলিকাতাস্থ "বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেশন" তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। দশব্যক্তি একত্রিত হইয়া একত্রীভূত মূলধনের দ্বারা প্রশস্তরূপে ব্যবসায়বাণিজ্য কখন আমাদের দেশে করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সর্ব্বপ্রথমে উক্ত "ব্যাঙ্কিং করপোরেশন"ই সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বোধ করি ৫।৬ বৎসর হইল তাঁহাদের "করপোরেশন" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ২০ লক্ষ টাকা মূলধন; দশটাকা করিয়া প্রতি অংশ। এই অনুষ্ঠানের সূচনায় আমরা যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। মনে আশা হইয়াছিল, যে এইবার, এতকাল পরে, বুঝি আমাদের দেশের প্রকৃত উদ্ধারের দ্বার উন্মুক্ত হইল, এইবার আমাদের দেশের লোক মূলধন জমা করিয়া,এবং দশজনের মধ্যে একটী কোম্পানী খাড়া করিয়া কার্য্য করিবার যে কি সুবিধা ও উপকার তাহা সমাক বুঝিতে পারিবে, এবং বুঝিয়া সমস্ত দেশমধ্যে দলে দলে একত্রিত হইয়া প্রশস্তভাবে ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু অতীব আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের এত আশার সংস্রাংশের একাংশও পরিপূরিত হয় নাই। আমাদের চিরাভ্যস্ত আলস্য এবং উদাসীনতাই যে আমাদের সকল প্রকার উন্নতির একমাত্র অন্তরায় তাহা আমরা জানি। যদি "ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের" উদ্যোগিগণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণরূপ যোগ্যতা এবং দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদিত করিয়া আপনাদিগের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও একদিন তাঁহাদের সুদৃষ্টান্তে আমাদের চক্ষু ফুটিবার সম্ভাবনা হইত। কিন্তু ভয় হইতেছে আমাদের অদৃষ্টদোষে তাহাও বুঝি ঘটিল না। ৪।৫ বৎসর "করপোরেশন" কার্য্য চালাইতেছেন, কি কার্য্য করিয়াছেন এবং কি প্রকারে তাহা করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশেষ অবগত হইতে পাই নাই, কিন্তু আজকাল শুনিতেছি যে, "করপোরেশনের" অবস্থা বড় ভাল নহে। কেন এরূপ ঘটিল, কি বিশেষ কারণে এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইল, তাহা অনুসন্ধান করিবার আবশ্যকতা নাই; কেননা ইহা আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, যে আমাদের জাতীয় চরিত্রে আলস্য, অনবধানতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি যে সমস্ত ভয়ানক দোষ আছে, তাহার জন্যই এই অনর্থ উপ-

স্থিত হইয়াছে। ভরসা করি, "করপোরেশনের" উদ্যোগিগণ আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন না, তাঁহাদের সূচিত কার্য্যটীকে আমরা একটী উচ্চতম জাতীয় কার্য্য বলিয়া মনে করি বলিয়াই তাঁহাদিগের উপর কোন প্রকার দোষারোপ করিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেছি না। আমরা, কি একা একা, কি দশজনে মিলিয়া, এখনও কার্য্য করিতে শিখি নাই। আমাদের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান দোষ—আলস্য এবং উদ্যোগহীনতা। যাহা হইতেছে হউক, ইহার পর দেখিব,—এইরূপ করিতে করিতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। তৎপরে, নিজে কার্য্য করিব না, দশজনে এক জনের স্কন্ধে সমস্ত ফেলিয়া দিব, অথচ সেই একজন কিছু করিলেও অবিশ্বাস করিব, এই আমাদের আর একটী প্রধান দোষ। আমাদের তৃতীয় দোষ, কার্য্য চালাইবার জন্য গোড়ায় বেশী খরচ করিব না, ভাল লোক কিম্বা যথেষ্ট লোক নিযুক্ত করিব না, যাহাদিগকে নিযুক্ত করিব তাহাদের উপর প্রথমে সম্পূর্ণ নির্ভর করিব এবং পরে অবিশ্বাস করিব। চতুর্থ দোষ, আমাদের কাযের কোনই ঠিকানা নাই, সময়ে হিসাব করিব না, সময়ে হিসাব দেখিব না, সময়ে তাগাদা করিব না, কিম্বা সময়মত সাধারণের নিকট কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করিব না। কার্য্য চলিতেছে চলুক, ভিতরে ভিতরে একটী, দুইটী, তিনটী কিম্বা দশটী দোষ ঘটিলেও, যতক্ষণ উপরে উপরে সুশৌষ্ঠবের সহিত কার্য্য চলিতেছে, ততক্ষণ আমাদের কোন খবরই নাই, তৎপরে দোষের উপর দোষ জমা হইয়া যখন সমস্ত কার্য্যটী উচ্ছিন্ন যাইবার দশায় উপস্থিত হইল, তখন সকলে মিলিয়া গোলযোগ এবং হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলাম। আবার শুধু হাহাকার নহে, পরস্পর বিবাদকলহ এবং পরস্পরের উপর দোষারোপ ও নিন্দাবাদ করিতে লাগিলাম। যে কার্য্যটী আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাতে একবারেই উচ্ছিন্ন হইয়া গেল; তৎসঙ্গে যাঁহারা তাহার উদ্যোগী ছিলেন, তাঁহাদের উৎসাহও চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গেল, এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সমস্ত দেশমধ্যেও ব্যবসায়বাণিজ্যের উপর একটী ভয়ানক অবিশ্বাস প্রচারিত হইল। আমাদের দেশে, ছোট বড়, সকলপ্রকার ব্যবসায়-কার্য্যই এইরূপে নষ্ট হয়।

আমরা এক্ষণে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের উদ্যোগিগণ যেন সময়মত সাবধান হয়েন, এবং যাহাতে তাঁহাদের উপর আমাদিগের এত আশাভরসা একবারে নষ্ট না হইয়া যায়, তাহার উপায়বিধান করেন। তাহারা একটী নূতন এবং বৃহৎ কার্য্যে ব্রতী আছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের তদনুরূপ পরিশ্রম করিতে এবং সাবধান হইতে প্রস্তুত থাকা উচিত।

৪। পতিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিতে হইলে "এলোমেলো" চেষ্টায় কিছুই হইবেনা। দেশের মধ্যে যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, বাস্তবিকই ভারত পতিত এবং তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টাকরা প্রধান কর্ত্তব্য, তাঁহাদের সকলকে একমত হইতে হইবে, এবং একপ্রণালীবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, নচেৎ কোন ফল হইবেনা, সকল চেষ্টা এবং পরিশ্রম বৃথা হইবে। কিন্তু আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে, একথা কাহারও সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয় না। একেত দেশের সাড়ে পনর আনা লোক অজ্ঞ; তাহারা নিজের উন্নতিও বুঝেনা

দেশের উন্নতিও বুঝেনা, কোন প্রকারে দিন কাটাইতে পারিলেই তাহারা সন্তুষ্ট; তাহাতে আবার যে অর্দ্ধ আনা লোক একটু একটু এ সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহাদিগের জন্য আমরা গৌরব প্রকাশ করি, তাঁহাদিগের দশজনের মধ্যেও দ্বাদশটী দল। রাজা যতীন্দ্র মোহন মহারাজাদ্বারভাঙ্গার সঙ্গে একমত নহেন, রায়বাহাদুর কৃষ্ণদাস যাঁরাহাদুর "অমুকের" সঙ্গে একমত নহেন, বাবুসুরেন্দ্র নাথ মিষ্টর "অম নাথের" সঙ্গে একমতনহেন। সকলেরই ঈশ্বর ইচ্ছায় এবং ইংরাজের প্রসাদে ক্ষমতা আছে, সকলেই আপনাপন ক্ষমতামত দলসৃষ্টি করিতেছেন। বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, বেষাবিষি চলিতেছে; ঠোকাঠুকি চলিতেছে, এইরূপ করিতে করিতে বৎসরের উপর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল, উপস্থিত আপনাপন মত এবং প্রস্তাব সাব্যস্ত রাখিবার জন্য সকলের সমস্ত ক্ষমতা এবং পরকতা ব্যয়িত হইতে লাগিল। কিন্তু ততক্ষণ ভিতরে ভিতরে দেশের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। দুর্ভিক্ষের উপর দুর্ভিক্ষ, মহামারীর উপর মহামারী, অত্যাচারের উপর অত্যাচার; অবিচারের উপর অবিচার! ব্যবসা নাই; বাণিজ্য নাই, শিল্প নাই, বিজ্ঞান নাই, যাহা ছিল তাহা গেল; যাহা ছিলনা, তাহাও হইলনা। স্বাধীনতা ত নাইই; স্বাধীনবৃত্তিও যাহা ছিল, তাহাও গেল। এখন চতুর্দ্দিকে কেবল দাসত্ব, দারিদ্র্য এবং দীনতা!

পূর্ব্বে কলিকাতায় দুইটী রাজনৈতিক দল ছিল; ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েশন এবং ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েশন; এখন আবার শুনিতেছি, আরও দুইটী আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইল। জমিদারদিগের মধ্যে একটী—নাম ইণ্ডিয়ান্ কনষ্টিটিউশনাল আসোসিয়েশন; এবং সাধারণের মধ্যে একটী—নাম ইণ্ডিয়ান্ ইয়ুনিয়ন। দ্বারভাঙ্গার নবীন মহারাজা বাহাদুর এই দুইটী আসোসিয়েশনেরই প্রধান প্রবর্ত্তক। রাজপুত্র এবং বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও মহারাজা বাহাদুর যে দেশের মঙ্গলের জন্য এতদূর উদ্যোগী, ইহাতে আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। একবৎসর বেঙ্গল কাউন্সিলের এবং তাহার পরবৎসর ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের মেম্বর হইয়া মহারাজা বাহাদুর যে দেশের অভাব সম্বন্ধে এতদূর অভিজ্ঞ হইয়াছেন তাহা আমরা জানিতাম না। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, যে দুইটী আসোসিয়েশন ছিল, তাহাদিগকে বলপ্রদান না করিয়া তাহার উপর নূতন করিয়া আর দুইটী আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত করিবার কি কিছু বিশেষ আবশ্যকতা ছিল? আমরা আরও শুনিয়াছি যে, হাইকোর্টের প্রায় সমুদয় ব্যারিষ্টার মহোদয়েরাও ইণ্ডিয়ান্ ইয়ুনিয়নের সভ্যশ্রেণিভুক্ত হইয়াছেন, এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহারাও বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। আমরা সবিনয়ে তাঁহাদিগকেও উপরোক্ত প্রশ্ন করিলাম। ইয়ুনিয়নের আবির্ভাবে আমরা বস্তুতঃ সুখী হই নাই। যদি ইহার উদ্যোগিগণ, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, কি কারণে এই সভা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ের একটী অতি গুরুভার অপসৃত হইবে। আমাদের মত এই যে, যাহা ছিল (ইণ্ডিয়ান্ আসোসিয়েশন) তাহাই যথেষ্ট; তাহা কাহারও নিজসম্পত্তি নহে; যদি তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতা কিম্বা অন্য কোনবিধ দোষ জন্মিয়া থাকে, সে সমস্ত সংশোধন করিয়া তাহারই উন্নতিসাধন করিলে দেশের বাস্ত-

বিক উপকার সাধিত হইত। যে দেশের ধনী এবং শিক্ষিতলোকদিগকে এখনও অঙ্গুলিদ্বারা গণনা করা যায় বলিলেও হয়, সেখানে রোজরোজ এক একটী পৃথক পৃথক সভা এবং সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমরা বলি, তাহাতে সে দেশের বলবৃদ্ধি না হইয়া বরঞ্চ প্রভূত পরিমাণে বলক্ষয় হয়। এরূপ হইলে সাধারণ লোকের বুদ্ধি স্থির হইতে পারে না, কেন না কোন্‌টী পরিত্যাগ করিয়া কোন্‌টীতে তাহারা যোগ দিবে তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না। কোথায় রোজ রোজ লোকের মনে ক্রমশঃ একতার ভাব পরিবর্দ্ধিত হইবে, না আমাদের চিরাভ্যস্থ পার্থক্য—যে পার্থক্যই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহা আরও প্রসারিত হইতে লাগিল। ভাই শিক্ষিত ভারতবাসি! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, এরূপ করিয়া কখন কি পতিতভারতের উদ্ধার হইবে?

ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের আশ্চর্য্য একতা সন্দর্শন কর, এবং তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দেশের—জন্মভূমির—প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা মনে মনে স্থির করিয়া লও। আমরা স্বর্ণভূমি ভারতের অধিবাসী। ভারত কতকালের দেশ, সভ্যতার এবং উন্নতির কত লক্ষ লক্ষ সরঞ্জাম ইহাতে মজুত রহিয়াছে, তথাপি এতদিনে আমরা একটুও অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কিন্তু দেখ, কয়েক সহস্র ইয়ুরোপীয় যে দেশে পদার্পণ করে, দেখিতে দেখিতে তাহারা সে দেশের কিরূপ অবস্থা করিয়া তুলে। আমেরিকার অবস্থা দেখ, কি ছিল কি হইয়াছে। আবার সেদিনকার অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থা সন্দর্শন কর, তাহাও কি ছিল কি হইয়াছে। কিন্তু কিসে এরূপ হইল? মন্ত্রেও হয় নাই, তন্ত্রেও হয় নাই, কেবলমাত্র দেশবাসিদিগের একতার ফলে হইয়াছে। একটী সমগ্র দেশের লোক যদি একমনে একপ্রাণে একঅভিপ্রায়ে এক উদ্দেশ্যে জন্মভূমির মঙ্গল কামনা করে, তাহা হইলে কতদিন সে দেশের উন্নতি হইতে বিলম্ব হয়? কিন্তু যাহাতে এই কথা রোজ রোজ আমাদের মনে ভাল করিয়া প্রবিষ্ট হয় সেইজন্য চেষ্টা করা উচিত, কি যাহাতে আরও আমাদের মনের এবং উদ্দেশ্যের অস্থিরতাবৃদ্ধি হয়, তাহাই করা উচিত? আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা যে সমুদায় শিক্ষিতসম্প্রদায় এই "ইয়ুনিয়ন" স্থাপন বিষয়ে আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করেন।

হঃ মঃ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রত্ন-রহস্য—নানাশাস্ত্র হইতে শ্রীরামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, শ্রীনিমাই চরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বহরমপুরে প্রকাশিত। কলিকাতা, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু এবং কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৯০ সাল। মূল্য ১।০ একটাকা চারি আনা মাত্র।

সাধারণতঃ রত্ন কাহাকে বলে, নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং প্রচক্ষতে।"

"প্রত্যেক জাতীয় বস্তুর মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট সেইটীই রত্ন। যথা স্ত্রীরত্ন, অশ্বরত্ন ইত্যাদি।"

পুনশ্চ,— "রত্নস্তু মণিভেদে স্যাৎ"— মণিবিশেষকেও রত্ন বলে।

রত্নশব্দের এই দ্বিতীয় অর্থের ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ মণিমাণিক্যসম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু আর্য্যেরা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার স্থূল মর্ম্ম সাধারণ্যে প্রকাশ করা সমালোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার এই উদ্দেশ্য সংসাধনকল্পে নানাশাস্ত্র আলোড়ন ও বিলোড়ন করিয়াছেন। "রত্ন রহস্য" গভীর গবেষণা ও অসামান্য পরিশ্রমের ফল। গ্রন্থকার 'অবতরণিকায়' একস্থানে লিখিয়াছেন;—

"ভরত খণ্ডীয় আর্য্য মহাপুরুষেরা যে একসময়ে সুসভ্য ও শিল্পনিপুণ ছিলেন, তাহা এই রত্নশাস্ত্রের দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যে শাস্ত্রের দ্বারা ভারতভূমির পূর্ব্বমহিমা বা প্রাচীন গৌরব প্রকাশ পায়, সে শাস্ত্রের আলোচনা না করা ভারতবাসিদিগের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা ভাবিয়াই আমি বহুব্যয় ও বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম।"

আমাদিগের বিবেচনায় রামদাস বাবু তাঁহার "রত্নরহস্য" প্রকাশ করিয়া প্রকৃত আর্য্যসন্তানেরই কার্য্য করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষই আদিম সভ্যস্থান, কেননা সভ্যতাও সমৃদ্ধিশালিতা ব্যতীত মণিমানিক্যাদীরকপ্রভৃতি রত্নের সমাদর কখনই সম্ভাবিত নহে। অতি পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে রত্নের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার প্রমান তাঁহাদিগের পঞ্চসহস্রাধিক বর্ষের রত্নশাস্ত্র। সভ্যতার ইহা অপেক্ষা বিশদ ইতিহাস আর কি হইতে পারে, আমরা জানিনা। রামদাসবাবু বিলুপ্তপ্রায় আর্য্য গৌরবের এই অমূল্য ও অভ্রান্ত ইতিহাস উদ্ধার ও প্রচার করিয়া সহৃদয় ভারতসন্তানমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

"রত্ন-রহস্য" পাঠে জানা যায় যে, প্রত্যেক মণিশাস্ত্রেই রত্নের পরিকর্ম্ম বা কর্ত্তনক্রিয়ার (Cut) বিষয় লিখিত আছে। মহর্ষি অগস্ত্য রত্নের "ছেদন" ও "উল্লেখন" করণের কথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন;

"রত্নানাং পরিকর্ম্মার্থং মূল্যং তস্য ভবেদ্যুতঃ।
ছেদনোল্লেখনৈশ্চৈব স্থাপনে শোভকুৎযথা॥"*

* "অগস্তিমতম্" নামক মণিপরীক্ষা গ্রন্থ—"রত্নরহস্যের" সহিত সংযোজিত আছে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসী আর্য্যেরা 'হীরা কাটিতে' জানিতেন ও তাহা কাটিয়া ব্যবহার করিতেন, ইহা আধুনিক সভ্যতা ও সূক্ষ্ম শিল্পাভিমানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য সংবাদ।

আর্য্যঋষিগণ রত্নদর্শনের পর স্থির করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বসমেত চৌরাশি প্রকার প্রস্তর জাতি আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাণাঙ্গক, কতকগুলি উদ্ভিজ্জ এবং কতকগুলি ভূমিজ।

কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধাতুও রত্ন নামে অভিহিত হয়। সেই জন্য পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন প্রভৃতির মধ্যে স্বর্ণের ও রৌপ্যের উল্লেখ আছে,—

"সুবর্ণং রজতং মুক্তা রাজাবর্ত্তং প্রবালকম।
পঞ্চরত্নকমাখ্যাতং শেষং রত্ন প্রচক্ষতে॥"

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর ও অগ্নিপুরাণে, ধারণের উপযুক্ত ছত্রিশ প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর রত্ন নামে খ্যাত।

গ্রন্থকার মুক্তা হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিবিধপ্রকার রত্নসম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়সকল সঙ্কলন করিয়াছেন। রত্নের গুণদোষ, পরীক্ষাপ্রণালী, মূল্যনির্দ্ধারণ প্রভৃতি যাবতীয় তত্ত্ব অতি সহজ ভাষায় ও শৃঙ্খলানুক্রমে রত্নরহস্যে' বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠকমাত্রেরই উপযোগী। ইহা যে কেবল কঠোর জ্ঞানগর্ভ, তাহা নহে; প্রত্যুত ইহার অনেকস্থল প্রচুরপরিমাণে আমোদজনক

পৌরাণিক মতে দুইখানি মহারত্ন ছিল,—"কৌস্তভ" ও "স্যমন্তক"। এই "স্যমন্তককে" কেহ কেহ বর্ত্তমান "কোহিনুর" বলিয়া অনুমান করেন। ইহাদের পুরাতন উপাখ্যান ও আধুনিক ইতিবৃত্ত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

"রত্ন রহস্য" হইতে আমরা হীরকের গুণ-পরীক্ষাপ্রণালী ও মূল্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"অত্যন্ত লঘু, বর্ণ ভাল, পার্শ্বদেশ উত্তম ও রেখাশূন্য, বিন্দুবর্জ্জিত, নিষ্কলঙ্ক, কাকপদ ও ত্রাস নামক দোষ না থাকা, এই সকল হীরকের গুণ এবং ইহার বিপরীত হইলেই দোষ—

"অত্যর্থং লঘুবর্ণতশ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু সম কং
তিতম।
রেখাবিন্দুকলঙ্ককাকপাদকত্রাসাদিভির্বর্জ্জি-
তম।"

"হীরকের শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ, এই চারিপ্রকার ছায়া বা বর্ণ আছে। তন্মধ্যে যাহা শ্বেত, তাহা ব্রাহ্মণজাতি। যাহা রক্তবর্ণ, তাহা ক্ষত্রিয়জাতি। যাহা পীতবর্ণ, তাহা বৈশ্যজাতি এবং যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহা শূদ্রজাতি। ব্রাহ্মণ জাতীয় হীরক বসায়নকার্য্যে প্রশস্ত ও সিদ্ধিদায়ক। ক্ষত্রিয়হীরক ব্যাধি ও জরা নাশক। বৈশ্যহীরক ধন ও শরীরের দৃঢ়তা প্রদান করে, এবং শূদ্রহীরক ব্যাধিনাশ ও বংশধ্বংস করে। অপিচ লক্ষণ-অনুসারে ইহাদিগের মধ্যে আবার পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক কল্পনা আছে। যাহা সুগোল, তেজস্বী, সম্পূর্ণ বৃহৎ ও রেখাদোষরহিত—তাহা পুরুষ। যাহা ষড়স্রি অর্থাৎ ষট্‌কোণ (ছয় পোয়ালযুক্ত) ও রেখাদিযুক্ত—তাহা স্ত্রী। আর যাহা ত্রিকোণ ও লম্বা—তাহা নপুংসক অর্থাৎ ক্লীব। এই জাতিত্রয়ের মধ্যে পুরুষহীরকই শ্রেষ্ঠ। পুরুষহীরকধারণে অনেক সুফল হয়। স্ত্রীহীরকধারণেপুরুষের কোন সুখ নাই, কিন্তু নারীর সুখ ও কান্তি বৃদ্ধি হয়। নপুংসকহীরা ধারণ করিলে বীর্য্য ও কামহানি হয়। এজন্য স্ত্রীদিগকে স্ত্রীহীরা ও ক্লীবদিগকে ক্লীবহীরা ধারণার্থে

প্রদান করিবেক। পরন্তু পুরুষহীরা সকলেই ধারণ করিতে পারে। হীরককে শুদ্ধ ও মৃত না করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবেক না। করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রোগ জন্মে। হীরককে যদি সংশোধন পূর্ব্বক মারিত করিয়া ঔষধরূপে সেবা করা যায়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক শুভফল পাওয়া যায়। যথা,—

"আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোত্যতি।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ॥"

"রত্নবিৎপণ্ডিতেরা বলেন যে, রত্নের গুণ-দোষ পরীক্ষা করিয়া পশ্চাৎ তাহা ধারণ করিবে। যে সে ব্যক্তি যে সে রত্ন ধারণ করিলে, তাহা তাহাদের অনিষ্ট আনয়ন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ হীরক-ধারণের পক্ষে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। কিরূপ হীরক কোন্ ব্যক্তির ধারণ করিতে হয়, তাহা বৃহৎ সংহিতা, গরুড়পুরাণ ও শুক্রনীতি গ্রন্থে লিখিত আছে। শুভলক্ষণান্বিত রত্নধারণে শুভ হয়, অশুভলক্ষণাক্রান্ত রত্নে অশুভ হয়। অতএব রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের দ্বারা রত্নগত শুভাশুভ লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিবেক।"

মানব যদি দুষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বন্ধুবান্ধবনাশ, শরীর-ক্ষয় ও ধনক্ষয় হয় এবং যদি শুভ-লক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করে, তবে তাহার বিদ্যুৎ বা বজ্রভয়, বিষভয়, সর্পভয়, বহ্নিভয়, ব্যাঘ্রভয়, চৌরভয়, ও জলভয় থাকেনা—শুভ হয় ও নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু ভোগ হয় এবং শত্রু ভয় থাকে না।

"সর্ব্বদ্রব্যাভেদ্যং লঘুস্নিগ্ধং তীক্ষ্ণতি রশ্মিবৎ স্নিগ্ধম্।"

হীরক ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দ্বারা হীরক উল্লেখিত (আঁচোড়িত বা খোদিত) হইবে না, অন্যান্য রত্নাপেক্ষা লঘু অর্থাৎ ওজনে হালকা হইবে এবং জলে ভাসিবে; রশ্মিযুক্ত অথচ স্নিগ্ধ (চেকনাই) থাকিবে।

"একস্যৈব হি বজ্রস্য দ্বেকবর্ত্তিমিতস্য চ।
সুবিস্তৃতদলস্যৈব মূল্যং পঞ্চ সুবর্ণকম্।
বর্ত্তিকাদলবিস্তারাৎ শ্রেষ্ঠং পঞ্চগুণং যদি।
যথা যথা ভবেন্নূনং হীনমৌল্যং তথা তথা॥"

একবর্ত্তি ওজনে একখানি নির্দ্দোষ ও উৎকৃষ্ট হীরকের মূল্য ৫ পাঁচ সুবর্ণ (৮০ রতি অর্থাৎ ৮/১০ আনা ওজনের স্বর্ণমুদ্রার নাম সুবর্ণ)। ইহাই হীরকের মূল্যের উচ্চসীমা বা মূল্যকেন্দ্র। ইহা অপেক্ষা যত রত্তি ওজন অধিক, বিস্তার অধিক ও উৎকৃষ্টতায় অধিক হইবে, ততই তাহার মূল্য প্রত্যেক রত্তি অনুসারে পাঁচগুণ অধিক হইতে থাকিবে এবং যেমন যেমন হীন হইবে তেমনি তেমনি মূল্যও হীন হইবে।

অপিচ রত্নের মূল্য সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম আছে, তাহা সর্ব্বরত্ন সাধারণ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—

"মূল্যাধিক্য যে ভবতি যদ্রত্নং লঘু বিস্তৃতম্।
গুর্ব্বল্পং হীনমৌল্যায় স্যাদ্রত্নং তদপি সদ্গুণম্॥"

যে রত্ন লঘু অথচ দেখিতে বড়, তাহার মূল্য অধিক। আর যাহা দেখিতে ছোট অথচ ওজনে ভারী তাহা গুণযুক্ত হইলেও অল্পমূল্য হইবে।

এসম্বন্ধে আমরা সচরাচর একটী প্রবাদ শুনিতে পাই, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে পূর্ব্বোল্লিখিত বচনগুলি আরও সপ্রমাণিত হয়ঃ—"রাজা চিনে দামে, ঘোড়া চিনে কাণে; নারী চিনে হাসে, পথের চিনে ভাসে"। যে প্রস্তর লঘু অথচ জলে ভাসে তাহাই যে উৎকৃষ্ট, ইহা এই প্রবাদ দ্বারা আমাদের দেশে চিরকাল সিদ্ধান্ত হইয়া আসিতেছে।"

'রত্ন রহস্যে' ধারণের উপযুক্ত মণিমুক্তা হীরা প্রস্তর ধাতু প্রভৃতি রত্ন ভিন্ন উপরত্ন অর্থাৎ 'ঝুটা' প্রস্তরাদির বিষয়ও লিখিত হইয়াছে।

এক্ষণে ধাতুসম্বন্ধে দুই একটী কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই 'সংক্ষিপ্ত সমালোচন' শেষ করিব।

ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ তিন প্রকার, পারদ-সম্ভূত*, লৌহসঙ্কর-জাত ও খনিজ।

রজত বা রৌপ্য দুই প্রকার,—খনিজ ও কৃত্রিম। পারদ ও সীসক দ্বারা কৃত্রিম রৌপ্য প্রস্তুত হয়।

তাম্র ডুমুরফলের ন্যায় রক্তকান্তি, স্নিগ্ধ, কোমল, ঘন অর্থাৎ সংহত, আঘাতসহ। লৌহ, কি বাঙ, কি সীসার সংস্রব না থাকে (এ সকল থাকিলে তাম্র কিছু কৃষ্ণবর্ণ হয়), এরূপ তাম্রই মারণের উপযুক্ত অর্থাৎ তাদৃশ বিশুদ্ধ তাম্র দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়।

লৌহ—অনেক প্রকার। লৌহ অতি অল্প মূল্যের বস্তু বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যন্ত্র কিংবা অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইলে তাহা মহামূল্য হইয়া পড়ে। শুক্রনীতিকার বলিয়াছেন যে,—

"যন্ত্রশস্ত্রাস্ত্ররূপং যন্মহামূল্যং ভবেদয়ঃ।"

যে লৌহ যন্ত্র শস্ত্র ও অস্ত্ররূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা মহামূল্য।

বৃহৎসংহিতাগ্রন্থে বজ্রস্য ধাতু নামক এক প্রকার মিশ্রধাতুর উল্লেখ আছে, তাহা-দ্বারা শিল্পিগণ উপকার পাইতে পারেন। ৮ ভাগ সীসা, ২ ভাগ কাঁসা ও ১ ভাগ পিত্তল একত্র গালিত করিলে বজ্রসংঘাত প্রস্তুত হয়। ইহা "বর্ষসহস্রায়ুত-স্থায়ী"—দশহাজারবৎসরেও নষ্ট হয় না, এবং "বজ্রা-দপি কঠিনতরঃ"—বজ্রাপেক্ষাও কঠিন।"

আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিব না। এই বৃহৎগ্রন্থে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহার সমস্তই, আমাদিগের বিবেচনায়, অবশ্যজ্ঞাতব্য। আর্য্যাপিতামহগণ সূক্ষ্ম শিল্পে কিরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ বস্তুবিদ্যা-বিশারদ ও বস্তু-রহস্যজ্ঞ ছিলেন, তাহা ইহার প্রত্যেক অক্ষরে প্রতিফলিত হইতেছে। রামদাস বাবুর ঐতি-হাসিক রহস্যের ন্যায় তাঁহার এই রত্নরহস্যও বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে রত্নরহস্য বস্তুতই এক খানি 'রত্ন'বিশেষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালী 'রত্ন'মাত্রই চিনিতে পারেন না, সুতরাং তাহার আদরও করেন না। 'মণি'-ভ্রমে অকিঞ্চিৎকর কাচখণ্ড কণ্ঠে ধারণ করিয়া সভ্যতাভিমান করিয়া থাকেন। কত দিন আর এরূপ করিবেন? "ম"

* পারা হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত হয় আমাদের দেশে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। "অমুক জায়গায় অমুক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে জানেন"। পুরাণ ও তন্ত্রে স্বর্ণ-প্রস্তুতকরণের বিবিধ বিধি আছে এবং এই সমালোচ্য পুস্তকেও ২।১। টী বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে।

সার-সংগ্রহ।

মাসিক পত্র।

ভারতী—ফাল্গুন, ১২৯০। ৭ম ভাগ; ১১শ সংখ্যা।

১। ধনুর্ব্বেদ। (শ্রীরামদাস সেন)—তৃতীয় প্রস্তাব। বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া রামদাস বাবু ধনুর্ব্বেদের আলোচনা করিয়াছেন। শরের লক্ষ্য বা বেধ্যবস্তু কি, কি প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হয়, কখন্ কোন্ হস্তের দ্বারা লক্ষ্যাভ্যাস করা বিধি, কিপ্রকার স্থানে ও কতদূরে লক্ষ্য স্থাপন করিতে হয়, কি পরিমাণ শ্রমক্রিয়া প্রকৃষ্ট, লক্ষ্যবস্তু কত উচ্চে থাকা আবশ্যক, যুদ্ধের জন্য কি প্রকার চিত্র-লক্ষ্য শিক্ষা করিতে হয়, শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া বেধ্যবস্তুকে বিদ্ধ করিবার উপায় এবং অদৃশ্য বস্তুকে বিদ্ধ করিবার কৌশল—এই সকল বিষয় এ প্রস্তাবে বিবেচিত হইয়াছে।

২। স্থানমান—দ্বিতীয় অধ্যায়। বস্তু, তাহার স্থিতি এবং দৃঢ়বস্তুর সংস্থিতি—এই দুই অংশের সংজ্ঞা সকল বিশেষ যুক্তির সহিত এ সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে। অনুমান বা কল্পনাকে পরিহার করিয়া যাহাতে বাস্তবিক স্থানমান করা যায়, তাহার শিক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য। অধিকাংশ সংজ্ঞাগুলি শব্দ বিশেষে উপযোগী বলিয়া বোধ হইল।

৩। লীলা—উপন্যাস। বাসর ঘর, বর-কন্যার পরিচয়, এবং বিয়ের কনে—এই তিন শীর্ষক তিনটী পরিচ্ছেদ এ সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রাজচরিত্র। (শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ)। পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর হইতে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়। এটী কুঁচ রাজ্যের ইতিহাস। বিশ্বসিংহের শেষ ও নবনারায়ণের রাজত্ব কাল এ সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

৫। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্তের অদ্বৈতবাদের সমালোচনা। (দ্বিতীয় অংশ)।

৬। ভাউ সাহেবের বখর। (দ্বিতীয়অংশ)।

৭। রামায়ণ। (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)। রামায়ণোক্ত "কূটাগার" শব্দের অর্থ কি এবং "অষ্টাপদাকার" অর্থাৎ পাশা লিখিবার ছকের মত নগর হইলে কি প্রকার সুবিধা, তাহার উল্লেখ করিয়া বাল্মীকির কবিত্বের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

বঙ্গদর্শন—মাঘ, ১২৯০। ১০৬ সংখ্যা।

১। দেবযান। (শ্রীরামদাস সেন)। Esoteric Budhism গ্রন্থে Sinnet সাহেব আত্মার যে "দেবচান" নামক স্থানে গমনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই "দেবচান" শব্দ কোন প্রাচীন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় কি না তাহার মীমাংসা করিবার জন্য উপনিষদোক্ত "দেবযান" কি, তাহার ব্যাখ্যা এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে।

২। দৈব ও পুরুষকার। (শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে)। যেমন কেবলমাত্র দৈবকে অবলম্বন করিয়া সংসারে সিদ্ধিলাভ হয় না, তেমনই আবার দৈবনিরপেক্ষ চেষ্টার দ্বারাও সকল প্রকার সিদ্ধি অনায়ত্ত। লেখক বলেন যে, সেই জন্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই প্রতি

নির্ভর করিতে পারিলে চেষ্টিতকার্য্যে ফললাভ করা যাইতে পারে।

৩। নববর্ষ। (পদ্য)।

৪। মনোরমা। (শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু)। বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনী উপন্যাসের মনোরমার চরিত্র এই প্রবন্ধে সমালোচিত হইয়াছে। লেখক বলেন যে, এক মনোরমাতে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসসকলের অনেক গুলির চরিত্র (একাধারে) মিলিত হইয়াছে।

৫। দেবী-চৌধুরাণী—উপন্যাস। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

৬। আমার দেবতা—একটী রূপক।

বঙ্গদর্শন যে প্রকার বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি করিয়াছে ও উন্নতির পথ দেখাইয়াছে, তাহাতে বঙ্গদর্শনের উন্নতি দেখিলে আমরা আন্তরিক আনন্দলাভ করিব। বঙ্গদর্শনেরও পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা উচিত।

নানা কথা।

আধুনিক সার্কস্ পূর্ব্বতন এম্ফিথিয়েটারের অনুরূপ। রোমক জাতি এই সার্কাসের উদ্ভাবক। অশ্বধাবনকৌশল-প্রদর্শন, বন্যপশুর প্রতি মনুষ্যশক্তির প্রভাব এবং ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন সার্কসের প্রধান উদ্দেশ্য। রোমক জাতি তৎকালজ্ঞাত পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক গ্রাস করিয়াও যুদ্ধপিপাসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল না—তাই সার্কস, এম্ফিথিয়েটার প্রভৃতির সৃষ্টি। ভীষণপ্রকৃতি রোমানেরা নানাপ্রকার নৃশংস-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদিগকে উত্তেজিত মনে করিত। বন্যপশুতে বন্যপশুতে, বন্যপশুতে মনুষ্যে এবং মনুষ্যে মনুষ্যে যুদ্ধ হইত। এক পক্ষের মৃত্যু না হইলে সেই যুদ্ধের শেষ হইত না। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই নিষ্ঠুর আমোদ তিরোহিত হইয়াছে। রোমসম্রাট্ হনেরিয়াসের সময় হইতে এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া গিয়াছে। সেই শোচনীয় পরিণাম তিরোহিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা তিরোহিত হয় নাই। এখনও পাশবশক্তির উপর মানবশক্তির প্রভাব প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পশুজাতির বুদ্ধিশক্তির অস্তিত্ব দেখান হইয়া থাকে। জানিতে পারা যায়, পুরাকালে রোমান দেব স্যাম্মিমান নামক সার্কসগৃহে পাঁচলক্ষ লোক ধরিত। উইল্‌সন সাহেবের সার্কসে বোধ হয় পাঁচহাজার লোক ধরে। চারুবার্ত্তা।

সূর্য্যমুখী ফুলের একটী বিশেষ গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাদের পক্ষীপালন ব্যবসায়, তাহারা সূর্য্যমুখীফুল কুক্কুটহংসদিগকে খাওয়াইলে অধিক পরিমাণে ডিম্ব পাইতে পারে। কৃষিবায় এই ফুলের চাস খুব হইতেছে।

ভারতবর্ষের কোহিনুর ও দরিয়ানুর—এই দুইটী হীরা জগদ্বিখ্যাত। সংপ্রতি আফ্রিকায় কোহিনুর অপেক্ষাও বৃহৎ একখানি হীরক পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকাতে ইহা কাটিয়া ৫৬টী পল তোলা হইয়াছে। ইহা ওজনে ১৩৫ ক্যারেট ছিল; এক্ষণে ৬২।০ ক্যারেট করিয়া দুই খণ্ড হইয়াছে। ইহার জ্যোতিঃ অল্প পীতবর্ণ বোধ হয়। ইহা কোহিনুর অপেক্ষা তিন অংশের দুই অংশ বৃহৎ। ইহার ব্যাস এক ইঞ্চি।

শি পঞ্জাবে "নেটিভ ফিমেল এডিনিয়ন" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হইবে। মৌলবী সাবদ আহম্মদ ইহার সম্পাদক। পত্রিকার অর্থ "দেশীয় স্ত্রীলোকের মত-প্রকাশক"।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতার বৈদ্যসমাজ এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে, বিলাতে কোন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কেহ দেশে প্রত্যাগমন করিলে বৈদ্যসমাজ তাঁহাকে সমাজচ্যুত করিবেন না। সে দিন প্রেসিডেন্সি স্কুলগৃহে বৈদ্যদের একটী সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় এই বিষয় ধার্য্য হইয়াছে। বাবু বিহারীলাল গুপ্তের ভ্রাতা মতিলাল গুপ্তকে সমাজে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয় নির্দ্ধারণার্থই উক্ত সভা আহূত হইয়াছিল। সকল সমাজেরই বৈদ্যদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তার কানাইলাল দে রায় বাহাদুর রসায়নশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্তপ্রিয়নাথ দে মাদকতাশূন্য "লাইম জুস্" প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শনী হইতে স্বর্ণপদক ও প্রথমশ্রেণীর প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন। এই ঔষধে অজীর্ণ, বাতব্যাধি, ও ম্যালেরিয়া বা প্লীহাগ্রস্ত পুরাতনজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত ভারতবাসিগণ বিগত অন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রথমশ্রেণীর প্রশংসাপত্র এবং সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেনঃ—
বদ্রিদাস মুক্তার জন্য; মহারাজা জিবাজুর ফটোগ্রাফির জন্য; কানাইলাল জহরির ঔষধির জন্য, প্রিয়নাথ দে লাইমজুসের জন্য।

লাহোর হইতে "সমাজসংস্কারক এবং বিবাহবিজ্ঞাপনী" নামে একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে সামাজিক বিষয় আলোচিত হইবে। বিধবাদিগের বিবাহ ঘটাইয়া দেওয়ার সুবিধা করাও ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য। এইবার ঘটকদের অন্ন গেল।

যে 'বঙ্গদর্শন' একদিন বঙ্গীয় সাময়িক পত্রের শীর্ষস্থানীয় ছিল, যে বঙ্গদর্শনে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এখনও লিখিয়া থাকেন,—সেই 'বঙ্গদর্শনে' 'পশুপতি-সম্বাদের' ন্যায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে দেখিলে কে না ব্যথিত হয়? অনেকে যে জন্য 'পশুপতি সম্বাদের' নিন্দা করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য উহার নিন্দা করি না। বঙ্গদর্শনে অনেক সময়ে ব্যঙ্গসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; এখনও হউক। প্রকৃষ্টরূপে ব্যঙ্গ করিতে জানিলে তাহা উপকারী ভিন্ন প্রায়ই অপকারী হয় না। কিন্তু 'পশুপতি সংবাদ' ব্যঙ্গ নয়;—কিছুই নয়। সাহিত্যাংশে বা কোন অংশে ইহার কিছুমাত্র মূল্য নাই। পৃথিবীর কোন দ্রব্যের সহিত যদি ইহার তুলনা করিতে হয়,—ইহা কতকটা সেই দ্রব্যবিশেষের তুল্য, যাহা সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক অথচ বিষম দুর্গন্ধময়। দ্রব্যটা কি বোধ হয়, বলিতে হইবে না; সকলেই বুঝিতে পারিবেন। 'পশুপতি সংবাদ' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই এত কথা হইল। উহা যদি চতুর্থ শ্রেণীর কোন সংবাদ বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত, কেহ উহার নামও করিত না। যাহা হউক বঙ্গদর্শনের ন্যায় পত্রের এরূপ 'সাহিত্যাতিসারাক্রান্ত' হওয়া লজ্জার বিষয় নহে কি? তবে বঙ্গদর্শন বলিতে

পারেন যে, বঙ্গে সাহিত্যানুরাগ আজ কাল সংক্রামক ব্যাধি। ব্যাধিগ্রস্ত হইলে বিশেষ লজ্জার বিষয় কি? অবশ্য একথার উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ।

সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নবপ্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে আমরা 'সঞ্জীবনী' হইতে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম,—

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার হাইল্যাণ্ড-বাসের আর একখানি বিবরণ বাহির করিয়াছেন। এই গ্রন্থে নানা অদ্ভুত কথা আছে। কোথাও মহারাণী লিখিতেছেন, তাঁহার কন্যা লুইসা ভৃত্য ব্রাউনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেছেন, কোথাও ব্রাউনের মৃত্যুশোকে মহারাণী খেদ করিতেছেন, কোথাও বা নির্জ্জনবাসের জন্য, প্রকৃতির ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইবার জন্য, বাসনা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই সংবাদপত্রের লেখকগণের দৃষ্টিবহির্ভূত হইতে পারিতেছেন না। যেখানে যান, সংবাদদাতাগণ সঙ্গে সঙ্গে,—তাড়াইলেও চলিয়া যায়না। একদিন মহারাণী এক মাঠে বসিয়া আছেন, একজন সংবাদদাতা দূরবীক্ষণযোগে তাঁহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, ভৃত্য ব্রাউন তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা করাতে একটা হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সংবাদদাতা বলিল "মহারাণীর মাঠে বসিয়া থাকার যেমন অধিকার, এই স্থান হইতে তাঁহাকে দেখিবারও আমার তেমনি অধিকার। সাধারণের স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার কাহারও ক্ষমতা নাই।' এমন সময় আরও কয়েকখানি সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণ আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দেবী চৌধুরাণী' নামক উপন্যাসের—(যাহা বঙ্গদর্শনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে) পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের শেষে 'নব্য বঙ্গের' পিতৃভক্তি সম্বন্ধে এই রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"আর্য্য পিতৃভক্তি বাঙ্গালামুলুকে আর নাই। ইংরেজী-শিক্ষার হলাহলে বাঙ্গালার প্রাচীন ধর্ম্ম জর্জ্জরিত হইয়াছে। পরমারাধ্য পরমপূজনীয় পিতাঠাকুর যাঁহার শ্রীচরণ কমল স্পর্শ করিতে সাহস হইত না, তিনি এখন 'মাই ডিয়ার ফাদারে' পরিণত হইয়াছেন, আর তিনি ভক্তির পাত্র নহেন, অনুযোগের পাত্রমাত্র। বাঙ্গালী হইয়া যে বাপকে 'বুড়া বেটা' না বলিল, সেই আজকাল সৎপুত্রমধ্যে গণ্য। এ সমাজ না কি আবার উন্নত হইতেছে,—অধঃপাতে যাইতেছে না, কেন না বাঙ্গালী স্পীচ দিতে শিখিয়াছে। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বক্তৃতা—আমাদের বড় লাভ হইয়াছে"।

কথা ঠিক। তবে পুত্র পিতারই অনুকরণ করিতেছে মাত্র। ইংরেজীওয়ালা 'পিতা—'পুত্রহ'কালে—পিতার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, 'পিতৃত্ব' কালে পুত্রের নিকট হইতে তাহাই ফিরাইয়া পান। পুত্র ভাবে না যে, তাহাকেও এক দিন পিতা হইতে হইবে; ইহাই বড় আক্ষেপ। উপরি-উদ্ধৃত কথা 'যে সে লোকের' নয়, অতএব বঙ্গীয় পুত্র ও পিতৃসম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিবেচিত হওয়া উচিত।

ইয়ুনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সে ৫ কোটী লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৫০ লক্ষ মাত্র পড়িতে পারে না; ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার মাত্র লিখিতে পারে না। আর সকলেই জানে। এ সাধারণ

শিক্ষোন্নতি নহে। পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ উন্নতি হইয়াছে, বোধ হয় না। বাঙ্গালায় ৭ কোটী লোকের মধ্যে ১ কোটী লেখাপড়া জানেন কি না সন্দেহ।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মহাকবি লর্ড টেনিসন "নববসন্ত" নামে একটি কবিতা "যুবকসহচর" নামক একখানি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দুই সহস্র টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কবিতাটী সাকল্যে ৪৮ ছত্রে, ২০৫ টী শব্দে শেষ। প্রত্যেক কথার মূল্য ১০৲ টাকা। গল্পে শুনিয়াছি, এক কথার মূল্য লক্ষটাকা। দেশবিশেষে ইহা হইবে বিচিত্র কি? মাইকেলের সমস্ত কাব্য কতমূল্যে বিক্রীত হইল—চিন্তা করিয়া আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। চা, বা।

এখন যেমন কাগজে ফটোগ্রাফ উঠান যায় তেমনি ফটোগ্রাফ রেশমী বস্ত্রে এবং সূতার বস্ত্রে উঠান যাইতে পারে। আর বিশেষ কথা এই, ধুইলে এবং সিদ্ধ করিলে ফটোগ্রাফ উঠিয়া যাইবেনা। বেশ হয়েছে!

প্রতি বৎসর আমাদের বড়লাট ও ছোট লাট সাহেব যথাক্রমে শিমলা ও দার্জ্জিলিং শৈলে শুভাগমন করিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতবাসে প্রভূত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। বৎসর বৎসর পর্ব্বতবাসে কি পরিমাণ অর্থব্যয় হয় নিম্নলিখিত তালিকা পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যাইবে।

১৮৭৩—৪	৪৭৫১৩০
১৮৭৪—৫	২৭৮৬৪০
১৮৭৫—৬	৬৬২৬০০
১৮৭৬—৭	৮২৭৮৯০
১৮৭৭—৮	৭৫৭৮৫০
১৮৭৮—৮	২৬৩৬০০
১৮৭৯—৮০	৩৭৯৬০
১৮৮০—৮১	৮৫৩০

ডাক্তার স্কবেস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে যখন একটু বেগে বায়ু বহিতে থাকে তখন ৫০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। প্রবল ঝটিকার সময় প্রবল তরঙ্গমালা প্রতিঘণ্টায় ১৫ ক্রোশ হিসাবে ছুটিতে থাকে।

জনৈক ফরাসী পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, রুষিয়া, ইতালি ও স্কটলণ্ডে হাজার করা উর্দ্ধসংখ্যা ৫ টী বিবাহসূত্র ছিন্ন হইয়া থাকে, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক ও হঙ্গেরীতে ৬ টী হইতে ১০ টী এবং ইউরোপের অবশিষ্ট দেশসমূহে ১০ টী হইতে ১৮টী পরিণয় এইরূপে বিচ্ছিন্ন হয়। স্বামী বা স্ত্রী-ত্যাগ করা সভ্যদিগের এখন একটা রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে পঁচিশকোটী। তন্মধ্যে প্রায় তেরকোটী পুরুষ এবং প্রায় সাড়ে বারকোটী স্ত্রীলোক। গৃহের সংখ্যা চারি কোটী পঁয়ত্রিশ লক্ষের অধিক। সহর এবং পল্লীগ্রামের সংখ্যা প্রায় সাতলক্ষ পনর হাজার। পৌনে উনিশ কোটীর অধিক হিন্দু; পাঁচকোটীর অধিক মুসলমান; চৌত্রিশ লক্ষের অধিক বৌদ্ধ; প্রায় উনিশ লক্ষ খ্রীষ্টান; অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। ভারতবর্ষের পরিসর প্রায় পনর কোটী বর্গমাইল।

ইংলণ্ডীয় শিক্ষাসমিতির সভাপতি জেম্‌স্ ওয়ার্ড বলেন যে, শিক্ষা-সম্বন্ধে শিক্ষকদিগের মধ্যে দুই প্রকার মত। এক শ্রেণীর শিক্ষকেরা কেবল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের মনে, অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যে, বহুবিষয়ের জ্ঞান সঞ্চারিত হয় তাহারই পক্ষপাতী। আর এক শ্রেণীর শিক্ষকগণ ঠিক ইহার বিপরীত মতাবলম্বী। তাঁহাদের মতে বহু বিষয়ের জ্ঞান দ্বারা সুকুমারমতি ছাত্রের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। যদ্দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হয় ও চিন্তাশক্তির প্রখরতা জন্মে তদ্বিষয়েই কেবল লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু 'মোটের উপর' এ দুই বিপরীত ও বিভিন্নমতের সামঞ্জস্যসাধনই প্রকৃত শিক্ষা।

প্রকৃত বিদ্বান কে? কেহ কেহ বলিবেন, যিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি সকল বিষয়েই পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই প্রকৃত বিদ্বান্‌নামের যোগ্য। কিন্তু সকল বিদ্যায় পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা মনুষ্যের নিতান্ত অসম্ভব। ম্যাথিও আরনণ্ড বলেন যে, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর জ্ঞানিলোকেরা যাহা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যিনি তৎসমস্ত জানেন, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে, ইহাও প্রকৃত বিদ্বানের লক্ষণ হইতে পারে না; যেহেতু এতদ্দ্বারা কোন বিষয়ের গভীর জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত পল্লবগ্রাহিত্ব বৃদ্ধি হয়। অতএব জন্‌ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ প্রকৃত বিদ্বানের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিসিদ্ধ। মিল বলেন যে, তিনিই প্রকৃত বিদ্বান, যিনি কোন একটী বিদ্যার সমস্ত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছেন এবং অন্যান্য সকল বিদ্যার সারভাগের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। এই লক্ষণ স্মরণ রাখিয়া সাধারণ শিক্ষা প্রণালী স্থির করা কর্ত্তব্য। ('সুরভী' হইতে সারসংগ্রহ)।

পুনানগরীতে একটী অতীব কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে। তথাকার একটী ব্রাহ্মণ প্রথমে একজনকে তাহার কন্যার সহিত বিবাহ দিতে স্থির করে। কিন্তু যখন অপর একব্যক্তি প্রথমাপেক্ষা অধিক টাকা দিতে স্বীকার করে, তখন লোভে ব্রাহ্মণ তাহাকেই জামাতৃত্বে বরণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়। তৎপরে তথায় তৃতীয় একব্যক্তি আরও অধিক টাকা দিতে চাহিলে ব্রাহ্মণের মস্তক ঘুরিয়া গেল। সে এক্ষণে কন্যাকে নিলাম করিতে মনস্থ করিয়াছে। যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিবে, তাহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিবে!

এ ঘটনাটী একটু সীমা অতিক্রম করিয়াছে মাত্র; নতুবা এই হতভাগা বঙ্গদেশেও, প্রকাশ্যে হউক, অপ্রকাশ্যে হউক, এই প্রকারের শোচনীয় বিবাহ নিত্য কত সংঘটিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। পল্লীগ্রামের নিরক্ষর লোকদিগের কথা বলিতে চাই না; অনেক বুদ্ধিমান লোকেও কন্যার বিবাহ দেওয়া বিপদ মনে করেন। তাঁহারা বলেন "কন্যাদায়"! যেরূপে হউক—ধিক্ এই কন্যার কল, কন্যার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা এক দাসত্ব হইতে অন্য কঠোরতর দাসত্বে পতন যাহাই হউক না কেন—যে কোন উপায়ে এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেই তাঁহারা বাঁচেন!

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল; বৈশাখ, প্রথম পক্ষ। [পঞ্চম সংখ্যা।

সমালোচনা ও সমালোচক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

পার্থক্য।—সংসারে যত প্রকার দ্রব্য আছে অর্থাৎ যত প্রকার দ্রব্য এপর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞানাধীনে আসিয়াছে, তাহাদিগের সকলেরই এক একটী স্বতন্ত্র নাম আছে। দ্রব্যমাত্রই এক একটী স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হওয়ার কারণ কি? কারণ—তাহাদিগের পার্থক্য বা বিভিন্নতা। আলোক ও অন্ধকার বিভিন্ন পদার্থ, এই কারণেই এতদুভয়ের স্বতন্ত্র নাম। আলোককে আলোক বলা যায়, কারণ উহা অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। যদি আলোক ও অন্ধকার একই পদার্থ হইত, উহাদিগকে স্বতন্ত্র নাম দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা হইত না। আলোক অন্ধকার হইতে বিভিন্ন,এই কারণেই আলোকের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব। রাম শ্যাম হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই রামের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে বিভিন্ন, এই কারণেই ক্ষুধা তৃষ্ণা দুইটী স্বতন্ত্র নাম। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, পার্থক্য বা বিভিন্নতা দ্বারাই পদার্থমাত্রের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব স্থিরীকৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হয়।

অনেক বস্তু আছে যাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রবল; আবার অনেক বস্তু আছে যাহাদিগের বিভিন্নতা অতি অল্প বা কম। অল্প বা অধিক পরিমাণে হউক, বস্তুমাত্রেরই পারস্পরিক বিভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী, নতুবা তাহাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব।

দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক বিভিন্নতার আধিক্য ও অল্পতানুসারে তাহাদিগকে তুলনা করণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণের তারতম্য হয়। সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রগুলির আপাততঃ যে বিভিন্নতা তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও অল্পায়াস-সাধ্য, কিন্তু নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক পার্থক্যানুভব করিতে হইলে কিঞ্চিদধিক পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা-শক্তি পরিচালন করা আবশ্যক। একটী হস্তীর সহিত একটী পিপীলিকার সাধারণতঃ যে যে অংশে বিভিন্নতা, তাহা নির্ণয় করা যেরূপ সহজ, দুইটী পিপীলিকার আকৃতিগত পারস্পরিক পার্থক্য স্থির করা অবশ্য তাদৃশ সহজ নহে। তিক্তে মধুরে যে আস্বাদগত পার্থক্য, তাহা অতি অল্পায়াসেই স্বীকৃত হইতে পারে, কিন্তু দুইটী 'মধুরের' কোনটী কতটুকু মধুর, ইহা প্রভেদ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা আবশ্যক। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে পার্থক্যের অল্পতা, সেই সকল স্থলে উক্ত পার্থক্য নিরূপণ করিতে পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা ও চিন্তাশক্তির নিপুণতার প্রয়োজন হয়।

বস্তুসমূহের নিকট সমাবেশ দ্বারা তাহা-

দিগের পারস্পরিক পার্থক্য অধিকতর সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। দুইটী গোলাপ পুষ্প পার্শ্বাপার্শ্বি রাখিয়া একটু সূক্ষ্মরূপে তুলনা কর, দেখিবে, উভয়ের আকার বর্ণ ও সৌরভগত একতাধিক্য সত্ত্বেও গোলাপ দুইটীর মধ্যে কোন না কোন অংশে কিছু না কিছু বিভিন্নতা আছে। সম্মুখে ঐ স্ফাটিকাধার ভেদ করিয়া বর্ত্তিকালোক সমগ্রগৃহে প্রতিফলিত হইয়াছে। আলোকটী সম্যক উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান। কিন্তু গৃহমধ্যে এক্ষণ যদি একটী বাষ্পীয়ালোক আনীত হয়, বর্ত্তিকালোকের ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তিত্ব হ্রাস হইবে, তাহাকে আর আলোকের পূর্ণ আদর্শ বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। পক্ষান্তরে বাষ্পীয়ালোকের সন্নিকটে একটী তাড়িতালোক সংস্থাপিত হউক, বর্ত্তিকালোকের ন্যায় বাষ্পীয়ালোক দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং তড়িতালোকের ঔজ্জ্বল্যই তখন প্রবল ও পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এক্ষণ বর্ত্তিকালোক বাষ্পীয়ালোক ও তাড়িতালোক এই তিনের মধ্যে যে পারস্পরিক বিভিন্নতা তাহা তাহাদিগের একত্রে সমাবেশ দ্বারাই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে পারি। প্রত্যুত আলোকত্রয়ের একত্রসংস্থাপন কখন প্রত্যক্ষ না করিলে তাহাদিগের পারস্পরিক বিভিন্নতা কদাচিৎ বিশদরূপে অনুভব করিতে পারিতাম।

পরন্তু শকুন্তলা ও সাবিত্রী দুইই স্বতন্ত্র চিত্র। চিত্রদ্বয়ের সমাবেশ দ্বারা উভয়ের সৌন্দর্য্যগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। শকুন্তলা ও সাবিত্রী উভয়েই প্রণয়ের জীবন্ত প্রতিকৃতি;—পবিত্রতা ও কমনীয়তার অনন্ত আবাসস্থল;—উভয়েই আত্মোৎসর্গের জীবন—সঞ্জীবনী প্রতিমা;—কবিকল্পনাপ্রসূত মনমোহিনী সৃষ্টি। শকুন্তলা সুন্দরী, সাবিত্রীও সুন্দরী। শকুন্তলার পার্শ্বে সাবিত্রী দাঁড়াইলেন। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্য মিলিল।

তাড়িতালোকের মিলনে বাষ্পীয় ও বর্ত্তিকালোক যেরূপ ক্ষীণপ্রভ হয়, এ স্থলের মিলন সেরূপ নহে। সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য দ্বারা যেমন শকুন্তলার সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না, শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে তেমনি সাবিত্রীর সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ উভয়েরই সৌন্দর্য্যের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে,—পার্থক্য আছে বলিয়াই উভয় চিত্রের সমাবেশ অধিকতর সুন্দর। আর সেই পার্থক্য নিরূপণ করিবার জন্যই উভয়ের সমাবেশ ও সমালোচন আবশ্যক।

সাদৃশ্য। একটী বস্তুর সহিত অপর একটী বস্তুর পার্থক্যানুভূতিই তত্তৎ বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রারম্ভ। পক্ষান্তরে, বস্তু সমূহের পার্থক্যানুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রামের ব্যক্তিত্ব শ্যামের ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও রাম ও শ্যাম অনেক অংশে সদৃশ। কেন না উভয়েই মনুষ্য, উভয়েরই চক্ষু কর্ণাদি সমান ইন্দ্রিয় আছে, উভয়েই চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট ইত্যাদি।

একটী বৃক্ষ অপর একটী বৃক্ষের সদৃশ।

একদিন অপর একদিনের তুল্য।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী ও স্কটের আইভ্যানহো সমশ্রেণীর কাব্য।

উপরে যে কয়েকটী পদার্থের নাম উল্লেখ করা হইল তাহাদিগের সাদৃশ্য অবশ্য পার্থক্যের সহিত বিজড়িত, যেহেতু পার্থক্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্র বস্তুত্ব অসম্ভব।

রামের সহিত শ্যামের অনেক অংশে সাদৃশ্য থাকিলেও অনেক অংশে পার্থক্য আছে।

একটী বৃক্ষ অপর একটীর অনুরূপ হইলেও প্রথমটী হয়ত অধিক পল্লব ও পত্রবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়টী অধিক ফলপুষ্পযুক্ত।

আজ ও কাল দুই দিনই একরূপ; কিন্তু অদ্যকার উত্তাপ কল্য অপেক্ষা অধিক, ভদ্ভিন্ন আরও গুরুতর বিভিন্নতা আছে।

বঙ্কিম বাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' ও স্কটের 'আইভ্যানহো' সমশ্রেণীর গ্রন্থ হইলেও ভাষা, ভাব ও কাব্যোল্লিখিত চরিত্রগত বহুবিধ পার্থক্য আছে।

পরন্তু কোন কোন দ্রব্যে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য আছে, কেবল অবস্থিতিস্থানভেদে তাহাদিগের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ও বামহস্ত উভয়েই সম্পূর্ণ অনুরূপ কিন্তু স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত এজন্য একখানি দক্ষিণ হস্ত ও অপর বামহস্ত।

এইরূপ কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য অধিক ও পার্থক্য অল্প ও কোন কোন দ্রব্যের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ পার্থক্যের আধিক্য ও সাদৃশ্যের অল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

দুইটী বালকের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের আধিক্য, কিন্তু একটী বালকে ও বৃদ্ধে পার্থক্যই অধিক। পক্ষান্তরে একটী মনুষ্যে ও একটী পশুতে যে পার্থক্য তাহা আরও অধিক। কিন্তু ইহারা সকলেই জীবনসম্পন্ন অর্থাৎ জীবনীশক্তি ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ, সুতরাং সেই অংশে ইহাদিগের সকলেরই পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে, মূলে একতা আছে।

একই ভাষায় লিখিত দুই খানি সমশ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে যেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেইই ভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিত উহাদিগের (কাব্য গ্রন্থদ্বয়ের) সেরূপ সাদৃশ্য থাকিতে পারে না, প্রত্যুত বিলক্ষণ পার্থক্যই লক্ষিত হয়। পরন্তু অপরভাষায় লিখিত একখানি বিজ্ঞান বা কাব্যের সহিত যখন ঐ একই ভাষায় লিখিত তিন গ্রন্থের কাহারও তুলনা করি তখন পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণ অধিকতর হয়। কিন্তু গ্রন্থগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও সে গুলি সকলই মনুষ্যের চিন্তাশক্তিপ্রসূত ও মনুষ্যভাষায় লিখিত। অপিচ উহাদিগের সকলেরই উদ্দেশ্য মনুষ্যের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তস্ফূর্ত্তি সাধন করা। এ কারণ সাধারণতঃ উহাদিগের পারস্পরিক সাদৃশ্য বর্ত্তমান। মূলতঃ উহারা সকলেই এক।

এইরূপে দেখা যায় যে, একতার মধ্যে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতার মধ্যে একতা প্রকৃতির সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। একতা হইতে বিভিন্নতা ও বিভিন্নতা হইতে একতা সমালোচনার দুইটী ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। এই দুই প্রণালীর একটীকে বিশ্লেষণ (Analysis) ও অপরটীকে সংশ্লেষণ (Synthesis) বলা হয়। ক্রমশঃ এই প্রণালীদ্বয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

আপাততঃ পার্থক্য ও সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমরা 'মোটের উপর' যে কয়েকটী কথার আলোচনা করিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করা আবশ্যক।

(১) পার্থক্যহেতুই ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা বস্তুত্ব এবং এই পার্থক্যানুভূতিই মনুষ্যজ্ঞানের প্রারম্ভ। (২) পদার্থমাত্রের পারস্পরিক পার্থক্যের ন্যায় পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে। (৩) পার্থক্য ও সাদৃশ্যের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বা হ্রাসাধিক্যানুসারে

তাহার নিরূপণোপযোগী পর্য্যবেক্ষণ ও সমালোচনের ভারতম্য হয়। (৪) তুলনীয় দ্রব্যসকলের সমাবেশ ও সংস্থিতির নৈকট্য তুলনার বিশেষ উপযোগী। (৫) পার্থক্য ও সাদৃশ্যহেতু বিভিন্নতার মধ্যে একতা ও একতার মধ্যে বিভিন্নতা।

পার্থক্য ও সাদৃশ্যের কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা হইল ও তাহার সহিত সাধারণ উদাহরণ দ্বারা সমালোচন প্রক্রিয়ার একটী অতি স্থূল অংশ কিয়ৎপরিমাণে দেখান গেল। এক্ষণ আমরা পার্থক্য ও সাদৃশ্য ব্যতীত সম্বন্ধের আর কয়েকটী অংশের সামান্যতঃ উল্লেখমাত্র করিব।

সম্বন্ধ। দুইটী ভিন্ন সত্তার অস্তিত্বকে পার্থক্য বলি। আর পার্থক্য সত্ত্বেও এক বস্তুর অন্য বস্তুগত যে ধর্ম্মবত্তা তাহাকে সাদৃশ্য বলি। কিন্তু সম্বন্ধ কি? একটী বস্তুর সহিত অপর একটী বস্তুর সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে উক্ত বস্তুদ্বয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসূচিত হয় সত্য, কিন্তু একের সহিত অপরের সম্বন্ধ বলিলে তাহাদিগের উভয়ের পারস্পরিক পার্থক্য ও সাদৃশ্য ভিন্ন আরও কিছু বুঝায়। অতএব একদিকে সাদৃশ্য ও পার্থক্য যেমন সম্বন্ধের অন্তর্গত, অপরদিকে তেমনি আরও কিছু আছে যাহা সম্বন্ধের অধিকারভুক্ত। সাদৃশ্য ও পার্থক্য বলিলে তুলনীয় বস্তুসমূহের স্বরূপমাত্রেরই সাদৃশ্য ও পার্থক্য বুঝাইতে পারে; আমরাও ঠিক সেই অর্থে উক্ত দুই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু একটী বস্তুর সহিত অপর একটী বস্তুর সংযোগে উভয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা বিভিন্ন বা বিমিশ্র প্রকৃতির তৃতীয় আর একটী বস্তুর যে অভ্যুত্থান হয়, এবম্বিধ সম্বন্ধসমূহ সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধের অন্তর্ভূত কদাচিত হইতে পারে, আর হইলেও তদ্দ্বারা আমাদের উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা হয় না। এই কারণেই আমরা সম্বন্ধ শব্দটী স্বতন্ত্ররূপে ও সম্যক প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি।

অনন্ত বিশ্বসংসার অসংখ্য সম্বন্ধপরম্পরার সমবায়মাত্র। এই সম্বন্ধসমষ্টি-উদ্ঘাটন প্রয়াস হইতেই বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি মনুষ্যের যাবতীয় শাস্ত্রের সৃষ্টি। মনুষ্য যে পরিমাণে সম্বন্ধপরম্পরার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে প্রকৃতি তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অসীম সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের অধিকার। সমগ্র শৃঙ্খল পরিমাপ করিয়া তাহার প্রকৃতি ও শক্তি নির্দ্ধারণ করা মনুষ্যক্ষমতার অতীত। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিগত যে সকল সম্বন্ধ দর্শনবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও বহুবিধ, অতএব সে সমুদায়ের আলোচনা বা উল্লেখ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কেবল সমালোচনার প্রকৃতি কিরূপ আর একটু বিশদ করিবার জন্য সম্বন্ধঘটিত কয়েকটী মূল বিষয়ের উল্লেখ করিব।

'সম্বন্ধ' 'মোটের উপর' দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—যথা,—নিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। অগ্নির সহিত উত্তাপের নিত্য সম্বন্ধ, কেন না অগ্নির সহিত উত্তাপ থাকিবেই থাকিবে; উত্তাপবিহীন অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু অগ্নির সহিত তাহার বর্ণের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনশীল, যেহেতু অবস্থাভেদে অগ্নির বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইতে পারে। আমরা 'নিত্য সম্বন্ধ' বিষয়ে একটু আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন নিত্যসম্বন্ধজ্ঞান মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা

কতদূর সম্ভব বলা যায় না। জ্ঞানমাত্রই মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল 'স্বভাবসিদ্ধি' বা আত্মপ্রত্যয়' জ্ঞানের কারণ হইতে পারে না। অগ্নিতে ও উত্তাপে নিত্য সম্বন্ধ, ইহা প্রথমতঃ পরীক্ষা ভিন্ন মাত্র 'আত্মপ্রত্যয়' দ্বারা স্বিকৃত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

একটু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, নিত্যসম্বন্ধ-জ্ঞান একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ-প্রত্যয়-জনিত নহে, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা তাহার অন্যতম কারণদ্বয়। প্রথমতঃ পরীক্ষা-দ্বারা অগ্নিতে তাপানুভূতি হইল এবং সকল সময় সকল অবস্থায় ও সর্ব্বত্র অগ্নি হইতে উত্তাপের বিচ্ছিন্নতা কখনই লক্ষিত হইল না। পুনঃপুনঃ পরীক্ষা দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মিল যে অগ্নিও উত্তাপে নিত্যসম্বন্ধ। এইরূপ পৌনঃপুনিক পরীক্ষা দ্বারাই ধর্ম্ম পরস্পরার সমবায়ে নিত্যসম্বন্ধ-বিষয়ক প্রত্যয় জন্মে। সোডা ও ক্লোরিণের সংমিশ্রণে লবন প্রস্তুত হয়। ইহাদিগের প্রকৃতিগত এই সম্বন্ধ কখনই বিধ্বংস হয় না। যতবার সোডা ও ক্লোরিণ একত্র করিলাম সর্ব্বত্র সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই লবণ প্রস্তুত হইল, সুতরাং সোডা ও ক্লোরিণ একত্রিত হইলেই লবণ প্রস্তুত হইবে ইহা স্বভাবতই প্রত্যয় জন্মিল। অপিচ ইহাও প্রতীত হইল যে, লবনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা সোডা ও ক্লোরিণ, ও উহাদিগের সংমিশ্রণের পরবর্ত্তী ফল লবন। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিশেষ বিশেষ পদার্থ বা ঘটনাপরম্পরার সমবায়দ্বারা অন্যবিধ কতকগুলি পদার্থ বা ঘটনার উৎপত্তি হয়। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ বা ঘটনাগুলি কারণ, আর পরবর্ত্তী পদার্থ বা ঘটনাপরম্পরা কার্য্য। এইরূপ কার্য্যকারণ-নিহিত সম্বন্ধানুসন্ধান হইতেই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানবিজ্ঞান। কারণমাত্রেই কার্য্যোৎপাদন-শক্তি-সম্পন্ন ও কার্য্যমাত্রেরই কারণ থাকা অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্যের এই সংস্কার পৌনঃপুনিক পরীক্ষা, পর্য্যবেক্ষণ বা সংক্ষেপতঃ সমালোচনা দ্বারা লব্ধ। আর কার্য্য-কারণ, সম্বন্ধপরম্পরার প্রকার-ভেদমাত্র।

দার্শনিকেরা চারি প্রকার 'কারণ' নির্দ্দেশ করেন। এতৎ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্তটী অতি পুরাতন হইলেও কারণচতুষ্টয়ের বিশেষ ব্যাখ্যোপযোগী, এ কারণ, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

কার্য্য—মৃণ্ময় কলস।

১ম কারণ;—মৃত্তিকা অর্থাৎ যে উপাদানে কলসটী গঠিত।

২য় কারণ,—চক্র, দণ্ড প্রভৃতি অর্থাৎ যে সকল যন্ত্রের দ্বারা কলসটী স্বকীয় আকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩য় কারণ:—কুম্ভকার অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলস নির্ম্মাণ করিয়াছে।

৪র্থ কারণ—কলসের উদ্দেশ্য অর্থাৎ জলাদি রক্ষা করা।

একটু অনুধাবন করিলে প্রতীত হইবে যে এই চারি প্রকার কারণ কলসের চারিটী সম্বন্ধমাত্র।

যে কোন বস্তু বা বিষয় সমালোচিত হউক তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, উৎপত্তি-মূল, ও উদ্দেশ্য এই চারিটী বিষয় সাধারণতঃ নির্ণীতব্য। (ক্রমশঃ)

ঠঃ, দঃ।

জাতীয় জীবন ও উন্নতি।

সংসারে জড় ও জীব এই দুই মাত্র পদার্থ আছে। আর্য্য-ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত নয় প্রকার পদার্থকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের সংযোজন ও বিযোজনে যাবতীয় সামগ্রীই সৃজন করা যাইতে পারে। যাঁহারা নির্দ্দেশ করেন যে, জড় হইতেই জীবের উৎপত্তি এবং প্রত্যেক প্রাণীই প্রাণীরূপে সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে জড় ছিল, তাঁহারাও এতদুভয়ের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। যদিও দেখা যাইতেছে যে, জড় হইতে জীবের উৎপত্তি হওয়ার বিপক্ষে বিশেষ যুক্তি নাই এবং জীবও পুনরায় জড় হইতে পারে, তথাপি উভয়ের অবস্থা ও কার্য্য দেখিয়া তাহাদিগের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিলে কোন অসুবিধা নাই। জীবাবস্থাপ্রাপ্ত জড় এবং স্বাভাবিক জড় কোনমতেই এক পদার্থ নহে এবং উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতে, হইলে পদে পদে অসুবিধা উপস্থিত হয়। এই কারণে জাতীয় জীবন হইতে জাতীয় উন্নতির উৎপত্তি হইলেও তাহাদিগকে জাতিগত পৃথক পৃথক সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত করা গেল বাস্তবিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে জাতীয় জীবন সংস্থাপিত না হইলে কোন জাতিই যে উন্নত হইতে পারে না, তাহা এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে যে, জাতিমাত্রই উন্নত হইত, তাহাতে সংশয় কি? জাতীয় জীবন ব্যতিরেকে কেহই যে উন্নত হইতে পারে না, আমরা এমন কথা বলি না, কিন্তু কোন একটী জাতির মধ্যে দুই চারিজন উন্নত হইলেই জাতীয় উন্নতি বলা যায় না। আবার উন্নত জাতির মধ্যে অনুন্নত যে কেহই নাই, তাহাও সম্ভব নহে। রোম যৎকালে স্বাধীনতার চরম সীমায় উপস্থিত তখন রোমে দাস ছিল এবং অধীনতার গভীর নিম্নাতে পতিত ভারতে এখনও বিস্তর ম্যাটসিনি থাকিতে পারেন। অতএব জাতীয় জীবন ও উন্নতির কথা বলিলে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ও উন্নতি না বুঝিয়া সাধারণের জীবন ও উন্নতি বুঝিতে হইবে, কেহই বাদ নাই, এমন নহে। যাহা উজ্জ্বল, তাহাই সুবর্ণ নহে, সকল ইংরাজ ক্লাইব নহেন, প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ নাই, বঙ্গদেশেও ওয়াসিংটনের জন্ম অসম্ভব নহে।

সমাজ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যহৃদয়ে এমন একটী বলবতী ইচ্ছা ছিল যে, সেই ইচ্ছার ধর্ম্ম-অনুসারে তাহারা পরস্পর একত্র বাস করে এবং একের জন্য অন্যে নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে অগ্রসর হয়। পশুদিগের ন্যায়, কেবল যে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ করিত, তাহা আমাদিগের বিবেচনায় সুযুক্তি বলিয়া বোধ হয় না। যেমন অপত্যস্নেহবশতঃ কেহই আপন সন্তানকে সাধ্যমতে বিনষ্ট করিতে চাহিত না, তেমনই সমাজিকতা-প্রবৃত্তি তাহাদিগের হৃদয়ের স্বাভাবিক গুণ বলিয়া লোকে প্রথমে একত্র মিলিত হইতে ও মিলিত হইয়া বাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আহারসংগ্রহ, আত্মরক্ষা ও যুদ্ধাদি কার্য্যে সামাজিকতার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া তাহারা আর পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে চাহিত

না সত্য। সমাজিকতা যে মনুষ্যহৃদয়ের একটী সহজাত ধর্ম্ম তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে কখনই সমাজ গঠিত হইত না এবং সংসারও চলিতে পারিত না। যদি কেহ এমন তর্ক উপস্থিত করেন যে, বিস্তর ইতরপ্রাণী সামাজিক না হইয়াও কি প্রকারে বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে আমাদিগের উত্তর এই যে, তাহাদিগের হৃদয়েও সমাজিকতা প্রবৃত্তি আছে এবং যে প্রবৃত্তির গুণে তাহারা স্ত্রীপুরুষে সাক্ষাৎ করে এবং সন্তানাদি প্রতিপালন করে তাহা সামাজিক প্রবৃত্তির আকার-ভেদমাত্র। তদ্ভিন্ন এমন কোন ইতর প্রাণীই দেখা যায় না, যাহারা আপন বা ভিন্ন জাতীয় জীবের সহিত সখ্যতা করিতে সম্মত নহে। সকল প্রাণীই সামাজিক জীব এবং মনুষ্যও সকল জীবের শ্রেষ্ঠ হইয়া স্বভাবতঃ সামাজিক না হইবে কেন? সমাজের প্রথম অবস্থায় যখন সমাজগঠন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই, তখন তাহাদিগের মিলিত হইবার কেবল কয়েকটীমাত্র সামান্য উদ্দেশ্য ছিল, এক্ষণে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত সেই উদ্দেশ্যসকল বর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ; নচেৎ যে প্রবৃত্তিহেতু তাহারা এক্ষণে একসমাজভুক্ত, তখনও সেই প্রবৃত্তিগুণে দলে দলে মিলিত ও সম্মিলিত হইয়া বাস করিত। জড়জগতে যেমন সংসক্তি ও রাসায়নিক সংযোজনগুণে প্রতি পরমাণু নিজ জাতীয় বা অন্য জাতীয় পরমাণুর সহিত মিলিত হয়, প্রাণিজগতেও তেমনই গুণ বা প্রবৃত্তি আছে যদ্দ্বারা একে অন্যের সহিত মিলিত হইতে চাহে এবং মিলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে। অন্তর্জ্জগতের যে প্রবৃত্তিগুণে একে অন্যের সৃষ্টির প্রক্রিয়াকার্য্যে মিলিত হইতে ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে চাহে, তাহাকেই আমরা এস্থলে জাতীয় জীবন আখ্যা প্রদান করিলাম।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয় জীবন সংস্থাপিত হইলে সে জীবনের কার্য্য কি? অণ্ড হইতে জীব উন্মুক্ত হইয়া যেমন অঙ্গসঞ্চালনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তেমনই জাতীয় জীবন সংস্থাপিত হইলে সে জীবন নিস্পন্দ থাকিতে পারে না। বাষ্পীয় যন্ত্রে বাষ্প পূর্ণ থাকিলে যেমন তাহার শক্তি প্রকাশ হয় এবং তাহার প্রতিরোধী অন্য শক্তি বিদ্যমান না থাকিলে যেমন সেই শক্তির কার্য্য সকল লক্ষিত হইয়া থাকে, অন্তর্জ্জগতেও তেমনই জীবন সংস্থাপিত হইলে অন্য প্রতিরোধী শক্তির অবর্ত্তমানে মনুষ্যও নানাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। জীবনীশক্তির প্রভাবেই জীবের কার্য্যের উৎপত্তি এবং যতক্ষণ শরীরে জীবন বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ তাহার কার্য্যও বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু জীবন শূন্য হইলে তাহার আর কার্য্য দৃষ্ট হয় না। আবার যতক্ষণ একটী বলের প্রতিযোগী বল বিদ্যমান না থাকে, ততক্ষণই তাহার কার্য্যকলাপ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সমান বলবিশিষ্ট প্রতিযোগী বল বিদ্যমান থাকিলে তাহার কোন কার্য্যেরই বিকাশ হয় না। জড়জগতে এই নিয়ম যে পরিমাণে প্রযুক্ত হয়, অন্তর্জ্জগতেও তাহার অন্যথা হয় না। এই কারণেই কোন নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক প্রতিরোধী বল বিদ্যমান থাকিলে মনুষ্যসমাজেরও কার্য্যকলাপ কার্য্যশীল না হইয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান ও স্থিতিশীল থাকে। যতদিন না একপক্ষ অপরপক্ষকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয়, ততদিন সে সমাজ নিষ্ক্রে

বা উচ্চে ধাবিত না হইয়া একস্থানেই স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকে এবং বিপক্ষবলকে হীনবল করিবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা উন্নতি এবং অধোগতি উভয় দিকেই হইতে পারে এবং অবনতি মনুষ্যের বাঞ্ছিত না হইলেও প্রতিযোগিবলকে পরাস্ত করিতে মনুষ্য যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান করে তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকেই তাহার গতি হয়। এই কারণে সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির অবস্থা সমান নহে অর্থাৎ বিপক্ষবলকে কেহ পরাস্ত করিতে সক্ষম হইয়া উন্নতির দিকে গমন করিতে পারিয়াছে, কেহ বা সেই বলকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্রোতের দিকেই অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, জাতীয় জীবন সংস্থাপিত হইলে কোন একদিকে তাহার গতি নিশ্চয় এবং সামাজিক বল অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলকে যে পরিমাণে পরাভূত করিতে পারিবে বা তদ্দ্বারা পরাভূত হইবে, সেই পরিমাণে সেই জাতির উন্নতি বা অবনতি হইবে। আর্ম্মেনিয়ান প্রভৃতি কোন কোন জাতি যে একবারে লুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার অন্য কারণ আর কিছুই নাই। মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রাণী একবারে লুপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাহাদিগের একটীও বিদ্যমান নাই। কিন্তু কোন সময়ে তাহারা যে এই পৃথিবীতে উপস্থিত ছিল, তাহার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, যে শক্তি তাহাদিগের শক্তির বিকাশ হইবার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা এতই প্রবল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার হস্ত অতিক্রম করিবার উপযুক্ত শক্তি বা উপায় ছিল না। কিন্তু ইহা স্থির হইলেও তাহাদিগের বিকাশ যে কত দিনে সাধিত হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন।

কণা কণা বালি লইয়া সাগর এবং এক একটী বালুকা লইয়া মরুভূমি সৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য উপকরণে রচিত হইলেও তাহারা স্বয়ং সামান্য নহে। এক একটী ক্ষুদ্র বল একত্রিত হইয়া যাহারা অন্যান্য সকল বলকে তুচ্ছ করিতেছে তাহারা যদি সামান্য, তবে সংসারে মহত্ত কি? বহুবল একত্র হইলেই অন্য বিরোধী বলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। মাধ্যাকর্ষণবল পৃথিবীর এক একটী পরমাণুর বল ভিন্ন অপর কিছুই নহে, কিন্তু এই বহুপরমাণুর বল একত্র হইয়া অন্যান্য গ্রহের নিজের বল না থাকিলে অনায়াসে তাহাদিগকে আপন গর্ভে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যেখানে বহুবল একত্র মিলিত হইয়াছে সেইখানেই অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বল পরাভূত হইয়াছে। সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিরহিত কোন বলই দেখা যায় না, এমন কি লোকে ঈশ্বরেরও প্রতিদ্বন্দ্বীর কল্পনা করিয়া থাকে। যে প্রকার গতিই অবলম্বন কর না কেন, দেখিবে যে, অন্য এক পদার্থ সেই গতিকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং তোমার শক্তি সামান্য হইলে অল্পই তোমার গতিকে রোধ করিতেছে। কেবল তোমার গতিকে রোধ করিবে এমন নহে, তোমার শরীর দুর্ব্বল হইলে তোমাকে পৃষ্ঠ পাতিয়া ভূমিতে পাতিত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তোমাকে পরাভূত করিবে। সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও এই নিয়ম। সামাজিক জীবন লাভ করিয়া মনুষ্যে যে সকল কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে যদি তাহাতে প্রয়োগ করিবার

তাহার প্রচুর শক্তি না থাকে, তাহা হইলে সে সকল কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইবে না, বরং নানাপ্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু সর্ব্বত্রই বলবানের জয় বলিয়া বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া যে সামাজিক জীবন প্রাপ্ত হয়, তাহার গতি সহজে প্রতিরুদ্ধ হয় না, এই কারণে কোন একটী বা কতকগুলি কার্য্যে সমস্ত জাতির যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং এ প্রকার না করিলে, প্রতিদ্বন্দ্বিবল অধিকশক্তি-সম্পন্ন হইলে, সে জাতির শ্রেয়োলাভ হয়না।

কি জড়জগতে, কি অন্তর্জগতে সর্ব্বত্রই লোকে প্রকৃতির সহিত চিরবিবাদে রত। অর্থাৎ অধিক বলবিশিষ্ট প্রকৃতি সর্ব্বত্রই সামান্য বলশালী মনুষ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। প্রাকৃতিক বলকে যে যত পরিমাণে পরাভূত করিয়া উচ্চবৃত্তি-সকলের পরিচালনকার্য্যে সক্ষম হইবে, সে ততই সভ্য হইবে এবং তাহার ততই পশুভাব অপনীত হইয়া মনুষ্যভাবের বিকাশ হইবে। প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে বিজয়ী হইয়া কি জড়-জগতে, কি অধ্যাত্মজগতে সর্ব্বত্র আপন ক্ষমতার স্ফূর্ত্তি করাই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই মনুষ্যের সকল কার্য্য এবং জীবন। নানাজাতীয় ও পৃথক্ পৃথক্ লোকে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পৃথক্ পৃথক্ পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ লোকে যেমন পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় অবলম্বন করে, মনুষ্যত্বলাভের জন্যও লোকে তেমনই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির বা যে জাতির স্বাভাবিক প্রবণতা যে দিকে, সে ব্যক্তি বা যে জাতি সেই দিকেই আপন কার্য্যকলাপকে পরিচালিত করিয়া তাহা হইতেই আপন অভীষ্টসিদ্ধি করিতে চাহে। হিন্দুর লক্ষ্য জ্ঞানের দিকে, প্রাচীন রোমের লক্ষ্য ছিল আধিপত্যের দিকে, ফ্রান্সের লক্ষ্য বিলাসিতার দিকে, ইংরাজের লক্ষ্য আত্মসুখের দিকে। ইহাদিগের মধ্যে অন্যান্য দিকেও কাহারও লক্ষ্য ছিল বা আছে এমন হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু এই সকল বিশেষ বিশেষ দিকেই তাহাদিগের জাতীয় লক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কেন না এই সকল দিকেই তাহাদিগের স্বাভাবিক প্রবণতা। কোন্ জাতির লক্ষ্য কোন্ দিকে, তাহা সেই জাতির কোন একটী ব্যক্তির কার্য্যকলাপের তত্ত্ব লইলেই জানা যাইতে পারে, কেন না তাহার কার্য্যকলাপ স্বাভাবিক প্রবণতাকে কখনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। এ স্থলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কোন একটী জাতির মধ্যে এমন লোক যে একেবারে থাকিবে না, যাহার স্বাভাবিক প্রবণতা অন্য দিকে, তাহা নহে; কিন্তু সে সকল ব্যক্তির বিষয় আমরা বলিতেছি না, কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যাহা উজ্জ্বল তাহাই যে সুবর্ণ হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। জাতীয় প্রবণতা বলিলে কোন এক জাতির অধিকাংশ লোকের স্বাভাবিক প্রবণতা বুঝিতে হইবে এবং কেহই যে বাদ নাই, এমন নহে। ফলতঃ বৈচিত্রময়ী সংসারের এমন নিয়ম নহে যে, সকল একজাতীয় পদার্থই সমান হইবে। যদিও দুই খানি প্রস্তর, দুইটী বৃক্ষ বা দুইটী পক্ষী দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, আমরা সহজে স্থির করিতে পারি না, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের মধ্যে শৈত্য ও উষ্ণতার মধ্যে যত প্রভেদ ততই প্রভেদ আছে, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিলেই জানা যাইতে পারে।

স্বাভাবিক প্রবণতার বাধ্য হইয়া যে জাতির, সকলে না হউক, অধিকাংশ লোকে কোন বিষয়বিশেষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে, তাহাকেই সেই জাতির জাতীয় উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। কোন বিষয়ই জাতীয় উদ্দেশ্য না হইলে পরিপুষ্ট হইতে পারে না, কেন না যাহা বহুজনসাপেক্ষ তাহা একের বা কয়েকজনের সম্পাদ্য নহে। বরং এক বা কয়েকজনে তাহা সাধনের চেষ্টা করিলে প্রতিদ্বন্দ্বী বলের দ্বারা পরাভূত ও আহত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল যেমন জীবনধারণ মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে, তেমনই জাতীয় সাধারণ লোকে মিলিত না হইলে জাতীয় জীবনই সংস্থাপিত হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে হিন্দুর স্বাভাবিক প্রবণতাবশতঃ জাতীয় জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্য হইল, কিন্তু তদ্বিষয়ে জাতীয় জীবন সংস্থাপিত হইতে পাইল না, কেন না যে যাহা শিখিতে লাগিল, সাধারণকে সে তাহার অংশ দিল না এবং বেদাদি অধ্যয়ন সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ হইল, সুতরাং জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জাতীয় উদ্দেশ্যও হইতে পাইল না। প্রাচীন রোম আধিপত্যপ্রিয় ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আধিপত্য জাতীয় উদ্দেশ্য হইতে পারে নাই এবং তদ্বিষয়ে জাতীয় জীবনও সংস্থাপিত হইতে পায় নাই। তাহার কারণ এই যে, আধিপত্য করিয়া অনেকে অনেক কে দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল এবং দাসসহবাসে আধিপত্যভাব দূষিত হইয়া তাহার স্থানে অধীনতা-ভাব জন্মিল, সুতরাং সকলের পক্ষে আর আধিপত্য জাতীয় উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইল না এবং আধিপত্য-লাভের জন্য জাতীয় জীবন ও রহিল না। ইহার ফল কি হইল? প্রাচীন ভারতের ন্যায় প্রাচীন রোমেরও অধঃপতন অনিবার্য্য হইল এবং ভারতের ন্যায় রোমও অতল জলধিতলে ডুবিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জাতীয় উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণরূপেই জাতীয় জীবনের উপর নির্ভর করিতেছে। যে জাতির সমস্ত শারীরিক ও মানসিক বল প্রতিদ্বন্দ্বিবলের বিপক্ষে না দাঁড়াইবে, তাহার উন্নতি ও মঙ্গল কোন শাস্ত্রেই লেখে নাই। এই জন্য যাহাতে জাতীয়ত্ব সংস্থাপিত হয় অগ্রে তাহার চেষ্টা, তৎপরে উন্নতি। উন্নত হইবার উপযুক্ত না হইয়া উন্নতির জন্য কাতর হইলে চলিবে না। আপন অঙ্গের বল না বুঝিয়া বিস্তীর্ণ জলাশয় পার হইবার চেষ্টা করিলে চেষ্টা সফল হইবে কেন?

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কি প্রকারে জাতীয়ত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে? এই নানা-জাতিপূর্ণ, নানাভাষা ও নানাধর্ম্ম প্রচলিত দেশে কি প্রকারে একজাতীয়ত্ব সংস্থাপন করা যাইতে পারে, তাহার মীমাংসা বড় সহজ নহে। সকলেরই এক দিকে লক্ষ্য থাকে, এমন উপায় সাধন করা অবশ্যই গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অসম্ভব নহে। আমাদিগের বিবেচনায় জ্ঞানই পুনরায় ভারতের সাধারণ লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত করিবার সামগ্রী এবং ধর্ম্মই উন্নতির সোপান। যাহাতে দেশ স্বাধীন হয়, রাজসিংহাসনে পুনরায় হিন্দুমুকুট শোভিত হয়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারা সে উন্নতি সম্ভাবিত না হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত শ্রেষ্ঠ অংশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে, একের ক্লেশে অন্য ক্লিষ্ট হইতে শিক্ষা করে এবং প্রেমের রাজত্বের দ্বার উন্মুক্ত হইতে পারে,

তাহা অসম্ভব বলিয়া আমরা স্বপ্ন দেখি না। ইংরাজ কবি পোপের মতে মনুষ্যের মনুষ্যই প্রকৃত আলোচ্য বিষয় (The proper study of mankind is man) কথাটী কোনমতেই ভ্রান্ত নহে। আপনার শ্রেষ্ঠক্ষমতার বিকাশ, সকললোকে সমান প্রীতি এবং জগতে প্রেমের রাজ্যবিস্তার যদি মনুষ্যের উন্নতি হয়, তবে মনুষ্যই মনুষ্যের আলোচ্য বিষয়। আর ইহা ভিন্ন সামান্য রাজ্য বা ধনবৃদ্ধিতে যে মনুষ্যের কি ইষ্টলাভ, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝি না,—জড়প্রায় ইয়ুরোপীয়েরা ভাল বুঝিতে পারেন। বস্তুতঃ আমি কি, আমি কেন এবং আমার আদি ও অন্ত কি, তাহা যদি না বুঝিলাম, তবে আর পৃথিবীতে আসিয়া বুঝিলাম কি? জড়জগতের শিক্ষা, জড়জগতের উন্নতি, জড়জগতের উপর আধিপত্য, কয়দিনের জন্য? মনুষ্যমাত্রই অনন্তকালের তুলনায় সামান্য জলবুদ্বুদের অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী এবং জড়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ চিরসম্বন্ধ নহে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে মনুষ্যের জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, জড়জগৎ তাহার শিক্ষার বিষয় হইতে পারে না। তাহার প্রকৃত শিক্ষার বিষয় অধ্যাত্মজগৎ এবং আত্মার উন্নতিই তাহার প্রকৃত উন্নতি। এই উন্নতি কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বারাই লাভ করা যাইতে পারে। জ্ঞান কোন সম্প্রদায়ের নিজস্ব নহে এবং কোন বিশেষ ধর্ম্মের কথাও আমরা বলিতেছি না। যে ধর্ম্মে আত্মতত্ত্ব জানা যায়, যে ধর্ম্মে সকল জীবে দয়ার উপদেশ দেয় এবং যে ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা নাই আমরা সেই ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। ইহাতে কেবল সহস্র-সম্প্রদায়-বিশিষ্ট ভারতের কেন, সমস্ত জগতের লোকেই একপ্রাণ হইয়া একজাতি হইতে পারে। সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার, সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্ম যদি সকলেরই লক্ষ্য হয় তাহা হইলে যে জাতীয়ত্বসংস্থাপিত হইবে এবং সেই জাতীয় জীবনে যে প্রবল বলের সঞ্চার হইবে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বল বোধ হয় আজিও জন্মে নাই।

জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে আজ কাল জগৎ বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। মধ্যে মধ্যে খ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মার অভ্যুত্থান কেবল এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ লোকের শিক্ষার জন্য। বর্ত্তমানকালে তদ্রূপ কোন মহাত্মার অভ্যুদয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় কোন অমানুষিজ্ঞানের উদয় না হইলেও যে জগতের উন্নতি সম্ভব নহে, তাহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তাঁহারা সকলে সংসারের উন্নতির জন্য আপন আপন জীবনে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন এবং যে সকল জ্ঞান, ধর্ম্ম ও উপদেশবাক্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত আজিও ঘোষিত হইতেছে; তবে আমরা অন্ধ ও বধির, কিছুই দেখিয়াও দেখি না, শুনিয়াও শুনি না। কোন অবতারের অভ্যুদয়ের আশা ত্যাগ করিয়া জগৎকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া মনুষ্যকে দেবতুল্য করিবার জন্য বিজ্ঞেরা যে সকল রত্নরাশি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে ভস্মবিমোচিত করিয়া জ্ঞানচক্ষে দৃষ্টি করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, মনুষ্যের প্রকৃত লক্ষ্য কি এবং কিসেই বা মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

অনাদি সোহাগী অতুল রূপসী
উষাটী আমার প্রাণ।
প্রভাত তারকা দেখা না দিতে,
ছুটে যাই নিতু হরষ চিতে,
রাঙ্গা বালিকার ভাঙ্গিয়া দিতে ঘুম,
অলস নয়ন শিশিরে ভিজায়ে
খাইতে শতেক চুম।
কাছে গিয়া, আহা, শিশির ছড়ায়ে
নয়নে না দিতে তার,
বামধনু গুঁড়া লয়ে মুঠি মুঠি
ঘুমল চরণে পাছে পাছে ছুটি
মাখাইয়া দেয় গায়।
ভাইতে প্রভাতে কালো দেহ মোর
মধুরে মধুর ভায়।
আশে পাশে যাহা পড়ে দুনয়নে,
মাধুরী তাতেই ছড়ায়ে দেই।
মাধুরী মদিরে হইয়া ভোর
কত পাখী করে গান।
কত ফুল খোলে প্রাণ।
আমার মতন মাধুরী ছড়াতে
দেখিয়া নয়ন দিয়া
দিতে থাকে সবে আপন মাধুরী
দিশে দিশে ছাড়াইয়া।
অনাদী সোহাগী অতুল রূপসী
উষাটী আমার প্রাণ।
প্রভাতের আগে সখাসখী দুটী,
যেথা যেথা থাকি, এক হয়ে জুটি
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিয়া বাঁধিয়া
গাই প্রাণভরা গান।

সে টুকু হৃদনে এক হয়ে থাকি,
হরষে জগত ভাসে,
প্রকৃতি রূপসী, কোথা হতে যেন,
দাঁড়ান আসিয়া পাশে।

পাতু'খানি টিপি টিপি, তপন চাদের মত
উষারে ধরিতে আসে মুখানি করিয়া নত
রবির পরশ পেয়ে, আকাশের যবনিকে
নিমেষে চলিয়া যায় কোন্ অজানিত দেশে,
আঁতিপাঁতি করি ভানু খোঁজে তারে
উগ্রবেশে।
পাঠাইয়া দেয় তার, কিরণ-পাহারাওলি
আকাশের চারিদিকে খুঁজিয়া আনিতে
উষারনে।
দেখাইয়া মরীচিকা রবিরে পাগল করি,
লুকায় আনন্দমুখী নিরাশার গভীর গহনে।

ঘুরিয়া বেড়াই আমি মনের উল্লাসে
রবিকর-স্রোতে, আহা, অনন্ত আকাশে।
ক্রমে রবি ঘুরি ঘুরি নিরাশায় হয়ে শক্তিহারা,
পশ্চিমের পদে গিয়া চায় ধীরে করুণার ধারা;
অমনি কোথায় হতে মুমূর্ষু তপনে
দেখা দেয় উষা আসি সহাস্য-আননে
আবার আমরা দুটী সখাসখী একত্রে মিলিয়া
ছড়াই সৌন্দর্য্যরাশি আনন্দেতে বিভোর
হইয়া।
দেখিতে দেখিতে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় মধুর মূরতি
পাখিগুলি দেয় ভেট মিষ্টগান করিয়া ভকতি।
গান শুনি মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে গিয়া নদীর ভিতর
আপনার মত ক'রে প'ড়ে লই পরের অক্ষর।

প্রকৃতির প্রিয়দাসী সন্ধ্যা আসে খুঁজিতে
উষায়
দেখিতে পাইয়া তারে উষাধনী কোথায়
পালায়।
ক্রমেতে সাঁজের তারা, ছড়াইয়া জ্যোতিধারা
আদর করিতে আসে উষা বালিকায়
আদরের ভয়ে উষা সুদূরে পলায়।
কত তারা আসে যায়, কেহ খুঁজে নাহি পায়
কোথা গিয়া ঘর বাঁধি থাকে লুকাইয়া
আদর চাহে না কার'—দেয় বিলাইয়া।
ক্রমে—প্রভাতের তারা, মুখানি তাহার
ফেরায় সুধীরে যেই,
পাগল বালিকা, অলস চরণে,
মোরে দেখা দেয় সেই।
অনাদী আদুরী, অতুল সোহাগী
উষাটী আমার প্রাণ।
প্রভাত সময় মধুর সন্ধ্যায়
হৃদয়ে হৃদয়ে করিয়া এক
গাই প্রাণভরা গান।

(ব)।

দর্শনকৌমুদী।

প্রস্তাবনা।

ভারতের শত্রুপক্ষীয়েরা যাহাই বলুন এবং দেশীয় অদূরদর্শী ধর্ম্মযাজকেরা যাহাই প্রচার করুন, অপরাপর জাতির সহিত তুলনা করিতে গেলে হিন্দুযুবকেরা যে অধিক ধর্ম্মচর্চ্চা করেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আর্য্যঋষিসন্তান হইয়া যতদূর ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত তাঁহারা ততদূর ধর্ম্মপরায়ণ নহেন এবং ধর্ম্মে অধিক মতি থাকিলেও হিন্দু শাস্ত্রের উপর যে অনেকের অনাস্থা জন্মিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যুবকেরা বিদ্যালয়ে যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন এবং তৎসম্বন্ধীয় যে সকল পুস্তক পাঠ করেন তাহা জড়প্রকৃতির ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ। শিক্ষকেরাও জড়প্রকৃতি লইয়া ব্যস্ত। যে সকল শিক্ষক আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছু জানেন বা অনুরাগ প্রকাশ করেন, তাঁহারা রাজকীয় বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারেন না। খ্রীষ্টীয়সমাজ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে যে সকল ধর্ম্মপুস্তক পঠিত হয় তাহাও আমাদিগের দেশের উন্নতমনা যুবকদিগের দ্বারা আদৃত হয় না। যুবকেরা যে সকল দেশীয় শাস্ত্রোক্ত ঘটনাকে বৃদ্ধা পিতামহীর উপন্যাসস্বরূপ বোধ করিতে শিখিয়াছেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকেরা সেই সকল উপন্যাস অপরভাষায় এবং অপরপরিচ্ছদে শিখাইতে চাহেন, সুতরাং আমাদিগের যুবকেরা দেশীয় শাস্ত্র অথবা বিদেশীয় শাস্ত্র কিছুরই সারগ্রহণ করিতে পারেন না। এদিকে তাঁহাদিগের ধমনীতে ঋষি-রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহারা ধর্ম্ম ভিন্ন থাকিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধি অনুযায়িক ধর্ম্ম সৃষ্টি করিতেছেন, কেহ বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের সারসংগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে ধর্ম্মের সার বলেন তাহা বাস্তবিক ধর্ম্মের সার কি না অর্থাৎ ঐ সকল সারে কোন সারত্ব আছে

কি না তাহাই এস্থলে আলোচ্য। "পরের অপকার করিও না," "ন্যায় পথে থাকিও" ইত্যাদি নীতিবাক্য সকলধর্ম্মেই আছে এবং যে কখন কোন ধর্ম্মপুস্তক না খুলিয়াছে সেও ইহার যাথার্থ্য বুঝিতে পারে। ধর্ম্মের শেষসীমা কি এবং দেশীয় ও বিদেশীয় শাস্ত্র-সমূহের তাৎপর্য্যই বা কি? যদি পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি নিয়ম একত্র সন্নিবেশিত করিলে অথবা সেইগুলি পালন করিলেই প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হইত, তাহা হইলে সকলদেশের সকল ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষেরা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতেন না। যদি কেবল মুদিতনেত্রে ঈশ্বরের ধ্যান অথবা মৃন্ময় মূর্ত্তির উপাসনাকে ধর্ম্ম কহ, তাহা হইলে মনু, শ্রীকৃষ্ণ, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, গৌতম প্রভৃতি মহাত্মাগণ কোন ধর্ম্মেরই ভিত্তিসংস্থাপন করিতে পারিতেন না।

আর্য্য ঋষিগণের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় বোধ হয় কোন বুদ্ধিজীবী লোকের নিকট দিতে হইবে না। যাঁহারা তাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থের কিয়দংশও পাঠ করিয়াছেন অথবা তল্লিখিত দুই চারিটী কথাও শুনিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদিগের স্থাপিত নিয়মাবলির প্রতি নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদিগের বিজ্ঞান-দর্শন ও অপরাপর শাস্ত্রের পরিচয় পাইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদিগের সভ্যতা ও সভ্যতাবিস্তারের কিঞ্চিন্মাত্র ও পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, ঋষিগণের মন কতদূর উন্নত ছিল এবং তাঁহারা বিদ্যার্ণবের কি রূপ গভীর স্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়ে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কেবল এক ধর্ম্মের বিষয়েই কি বৃদ্ধা পিতামহীর কথা শুনিয়াছিলেন? এবং যাঁহাদিগের এতদূর বিদ্যা ও বুদ্ধি ছিল তাঁহারা কি রূপে ঐ সকল অসংলগ্ন উপন্যাস বিশ্বাস করিতেন?

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মের শাখা, ইহা ভাষাতত্ত্ব এবং ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত-মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কি পৃথিবীশুদ্ধ লোক এতই নির্ব্বোধ ছিল যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ অধুনা-আবিষ্কৃত "স্বাভাবিক ধর্ম্ম" বুঝিতে পারেন নাই? যদি সহস্র বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে আমাদিগের এতই ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বতন দর্শন ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র অথবা সংস্কৃত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি মৃত-ভাষার আমরা অদ্যাপি কোন উন্নতিসাধন করিতে পারি নাই কেন? যাঁহারা কেবল জড়বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, যাঁহারা জড়প্রকৃতি ভিন্ন অপর কিছুই জানেন না অথবা যাঁহারা আপন আবিষ্কৃত কিম্বা আপন সম্প্রদায়ের মতের বহির্ভূত অপর কোন কথাই শুনিতে চাহেন না, এ প্রবন্ধ বোধ হয় তাঁহাদিগের পক্ষে তৃপ্তিকর হইবে না। যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া যুক্তি শুনিবেন না, তাঁহাদিগকে কে বুঝাইতে পারে? যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া তমোবলে অন্ধ হইবেন, তাঁহাদিগকে কে চক্ষুদান করিতে পারে? তবে যাঁহাদিগের হিন্দু-ঋষিদিগের উপর আস্থা আছে, যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য জানিতে উৎসুক, তাঁহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ লেখা যাইতেছে। যাঁহারা বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের নিকট হইতে হিন্দু-শাস্ত্রের পরিচয় পাইয়াছেন, অথবা চতুষ্পাঠীর তর্কবিশারদ মহোদয়গণের নিকট হইতে শাস্ত্রের বাক্যার্থ শুনিয়াছেন, তাঁহারা যদি ঐ সকল মতকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে দর্শন-কৌমুদী-পাঠে তাঁহারা সন্তোষলাভ করিতে পারিবেন না।

তবে যাঁহারা কোন নিষ্ঠাব্রত ব্রাহ্মণ প্রমুখাৎ, অথবা কোন যোগবত সন্ন্যাসীর অনুগ্রহে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব শুনিয়াছেন, অথবা যাঁহারা নিজের স্বাভাবিক জ্ঞান ও বিচারশক্তির সমন্বয়ে ধ্যান করিতে শিখিয়াছেন, এ প্রবন্ধগুলি সৌন্দর্য্যবিহীন হইলে ও তাঁহাদিগের নিকট আদরণীয় হইতে পারে। তবে "নিষ্ঠাব্রত ব্রাহ্মণ", "যোগবত সন্ন্যাসী", "স্বাভাবিক জ্ঞান", "বিচারশক্তি" ও "ধ্যান" কাহাকে বলে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে পাঠকগণ বুঝিতে পরিবেন।

যাঁহারা ঋষিগণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন এবং যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, আমাদিগের শাস্ত্রে যাহা কিছু লেখা আছে তাহার এক অর্থ নহে। এক একটী অধ্যায়ের, এক একটী শ্লোকের, এমন কি, এক একটী পদেরও অন্ততঃ সাতপ্রকার অর্থ হয়; —স্থানবিশেষে দ্বাদশ-অথবা ততোধিক অর্থও আছে। শাস্ত্রে উপন্যাসের ছলে ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, যোগতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়ই বর্ণিত আছে। রামায়ণে শুদ্ধ রামরাবণের যুদ্ধ, অথবা মহাভারতে শুদ্ধ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণিত হয় নাই। পাঠকগণ যে স্থলে হনুমানের বিক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছেন অথবা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন, সেই স্থলেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এক একটী সূত্র অথবা যোগের এক এক বিন্দু অমৃত লুক্কায়িতভাবে আছে। যাঁহারা শ্লোকের কি রূপে অর্থ ভাঙ্গিতে হয় জানেন তাঁহারাই এ সকল শ্লোকের এক দুই বা ততোধিক অর্থ করিতে পারেন। এক এক শ্লোকের সমস্ত অর্থসংগ্রহের সঙ্কেত আছে, কিন্তু এই সঙ্কেত সকলের জন্য নহে। সঙ্কেতের নিয়মাবলি লুক্কায়িতভাবে আছে। যাঁহাদিগের নিকট আছে, তাঁহারা উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত প্রকাশ করেন না, কেন করেন না, সে কথা পরে বলা যাইবে। তবে হিন্দুসন্তানগণের আনন্দবৃদ্ধির জন্য এ স্থলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন শাস্ত্রই লুপ্ত হয় নাই। এখনও এমন কতকগুলি মহাত্মা আছেন, যাঁহারা যত্নে ঐ সকলগুলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, উপযুক্ত সময় হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাহির করিয়া দিবেন। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে, লেখক উল্লিখিত সঙ্কেত ও লুপ্ত শাস্ত্রগুলি সমস্ত পাইয়াছেন, তবে সৌভাগ্যবশতঃ কতিপয় বিষয়ের যে রূপ আভাস পাইয়াছেন তাহাই এ স্থলে লিখিতেছেন। যাহা পাইয়াছেন তাহা আভাসমাত্র, কারণ তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন তাহা যৎসামান্য। শিক্ষকদিগের অনুকম্পায় অনেক উপদেশ পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু যে উপদেশ পাইয়াছেন তাহাও ঠিক্ বুঝিয়াছেন কি না, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। কেন না, যে সকল বিষয় লিখিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। তবে লেখক এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে, তিনি যাহা বুঝিয়াছেন তাহা তাঁহার সমপাঠী অথবা তাঁহার ন্যায় অপর শিষ্যের জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন। যে সকল বিষয়, সকলের সহিত ঐক্য হইয়াছে তাহাই এ স্থলে লিখিত হইতেছে এবং যে সকল বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অনৈক্য আছে তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইল। যাহা লিখিত হইবে তাহা সরল ভাষায় লিখিত হইবে অর্থাৎ শাস্ত্রের পরি-

ভাষায় লেখা যাইবে না। আবালবৃদ্ধ সকলেই যাহাতে লেখকের ভাবার্থ বুঝিতে পারেন, এরূপ চেষ্টা করা যাইবে। তবে লেখক কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন তাহা বলা যায় না। যাঁহারা শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝেন তাঁহারা যদি কোন স্থলে কোন ভ্রম দেখেন এবং অনুগ্রহ করিয়া ঐ ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন তাহা হইলে লেখক তাঁহাদিগের নিকট অতিশয় বাধিত হইবেন।

অবশেষে বক্তব্য এই যে, লেখকের বাল্যাবধি হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থা আছে। কিন্তু তিনি শাস্ত্রোক্ত সমস্তবিষয়ে সংশয়রহিত ছিলেন না। পরে সৌভাগ্যক্রমে কতকগুলি হিমালয়বাসী ঋষিদিগের স্থাপিত তত্ত্বজ্ঞান সভার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ঐ সভার প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক বিশেষতঃ Isis Unveiled, Esoteric Budhism, Fragments of Occult Truth এবং Theosophist নামক মাসিক-পত্রিকাপাঠে লেখকের অনেক সন্দেহ দূর হয় এবং তিনি তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ও বিচারশক্তির সমন্বয়ে শাস্ত্রোক্ত ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য করিতে শিখেন। মান্দ্রাজে শ্রীযুক্ত শুভরাও নামক এক কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি ইংরাজিতে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র এবং নিজের অধ্যবসায়ে দেশীয় এবং দেবভাষায় লিখিত শাস্ত্রগুলি এতদূর আয়ত্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে অনেকে ভারতবর্ষীয় মোক্ষমূলর বলিয়া সমাদর করেন। আর্য্যাবর্ত্তে যেরূপ শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়, দাক্ষিণাত্যে সেইরূপ শ্রীযুক্ত-শুভরাও উচ্চতম আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ Theosophist পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ গুলিতে যেরূপ যুক্তি দর্শান হইয়াছে, তাহা অকাট্য। ঐ প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য বেদান্ত, বৌদ্ধ এবং অপরাপর মতগুলির সামঞ্জস্য সাধন করা। লেখক পূর্ব্বোক্ত পুস্তক, পত্রিকা ও প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের তাৎপর্য্য যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাদিতে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিবেন। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তাগণ মানববৃন্দকে তত্ত্বজ্ঞান-লাভপক্ষে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন এবং লেখক তাঁহাদিগের মতপ্রচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহারা আহ্লাদের সহিত অনুমতি দিয়া লেখককে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীকু—।

বিজ্ঞানদর্পন—পৌষ, ১২৯০। দ্বিতীয় ভাগ, ৭ম সংখ্যা।

বিজ্ঞান-দর্পণের উপযুক্ত বিষয় সকলই সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, যাহাতে বিষয়গুলি তাঁহাদিগের পাঠের আরও উপযোগী হয় তৎপক্ষে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

১। আলোক, বিজ্ঞান—(শ্রী শ্রীনাথ সিকদার, এল্, এম্, এস্)। প্রথম পরিচ্ছেদে উত্তাপ হইতে আলোকের উৎপত্তি, দীপ্তি-বিকীরণের নিয়ম ও জ্যোতির্গমনের বেগ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সামতলিক ও কটাহবৎ মধ্যনিম্ন দর্পণ হইতে আলোক প্রতিবিম্বনের বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

২। সামুয়েল্ হানিমান।—শ্রীপ্যারিলাল মুখোপাধ্যায়। (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) হানিমানের জীবনী। অনেকগুলি দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে প্রদর্শিত ও সমালোচিত হইয়াছে।

৩। চিত্রবিদ্যা—(শ্রীশরৎ চন্দ্র দেব)। উপক্রমণিকা— পাঁচ অধ্যায়ে চিত্রবিদ্যা বিভক্ত হইয়া বর্ণিত হইবে:—(১) অঙ্কন, (২) ব্যবহারিক পরিপ্রেক্ষিত, (৩) শারীর স্থান, (৪) বর্ণ রেখা এবং (৫) প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি চিত্র। উপকরণ ও যন্ত্রাদি কোন্ অধ্যায়ে থাকিবে? লেখক বলিয়াছেন যে, চিত্রবিদ্যা শিখিবার জন্য বিশেষ ক্ষমতা (Genius) প্রয়োজনীয় নহে, সকলেই ইহা শিখিতে পারে। সক্রেটিস্ ইহা স্বীকার করিতেন না।

৪। প্রকৃতি পরিচয়— শ্রীনগেন্দ্রনাথ ধর, এম. এ বি, এল্,। (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন বাহির করিবার উপায় তাহার পরীক্ষা, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

৫। প্রাচীন বার্ত্তা বা জীবিকাশাস্ত্র— শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ। (পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)। পূর্ব্বকালের ১২টী জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়ের প্রথম দুইটী অর্থাৎ বিদ্যা ও শিল্প পূর্ব্বে বিবেচিত হইয়াছে। এ সংখ্যায় শিল্পের অতিরিক্ত কথাগুলির উল্লেখ আছে এবং অবশিষ্ট উপায়গুলিও বিবৃত হইয়াছে; যথা—(৩) ভৃতি অর্থাৎ দাসত্ব, (৪) সেবা অর্থাৎ মোসাহেবী করা, (৫) গোরক্ষা, (৬) বিপণি অর্থাৎ বাণিজ্য, (৭) কৃষি, (৮) গিরি অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে তৃণ, ধাতু ইত্যাদি আহরণ করা, (৯) ভৈক্ষ অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি, (১০) কুসীদ অর্থাৎ তেজারতী, (১১) শকট অর্থাৎ গাড়ীর ব্যবসা এবং (১২) আনুপ অর্থাৎ জল হইতে তৃণ, নল, মৎস্য ইত্যাদি আনয়ন করা। এতদ্ভিন্ন রাজা ও রাজপুরুষদিগের আরও কয়েকটী জীবিকার উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা— পথ ও সেতু প্রস্তুত করা, খনি ও আকর আবিষ্কার করা, প্রজা ও বণিকদিগের নিকট হইতে কর ও শুল্ক গ্রহণ করা এবং গ্রাম নগর ও পণ্যবীথি-সংস্থাপন করিয়া উপার্জ্জন করা। পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার জীবিকার মধ্যে বাণিজ্যই প্রধান ও সুপ্রশস্ত। বাণিজ্যবৃত্তিটী সপ্তাঙ্গ; যথা—(১) গাণ্ডিক ব্যবহার, (২) নিক্ষেপ,

প্রবেশ অর্থাৎ বন্ধক দ্রব্য, (৩) গোষ্ঠীকম্ম অর্থাৎ কোর্ট অব্ ওয়ার্ড, (৪) পরিচিত গ্রাহকাগমন, (৫) মিথ্যা ক্রয় কথন, (৬) কূট তুলামান এবং (৭) দেশান্তর হইতে ভাণ্ডানয়ন। এক্ষণে অনেকগুলি জীবিকা বাঙ্গা অধিকার করিয়াছেন, যেমন— লবণ প্রস্তুত করণ। লবণভূমিতে কি প্রকারে লবণ ও কাচ উৎপন্ন হইতে পারে প্রসঙ্গক্রমে তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশটুকু আমরা উদ্ধৃত করিলাম। "লবনাম্ব নদী কি খালের তীরবর্ত্তী ভূমিতে জোয়ারের সময় যে পর্য্যন্ত লোণা জল উঠে, ক্ষেত্রের সেই পর্য্যন্ত নিম্ন প্রবণ অর্থাৎ শ্লোপিং বা ঢাল করিয়া চাঁচিয়া নদীর কি খালের ঠিক কিনারার অর্থাৎ ভাটার সময় যে স্থানের জল আর কমে না, সেই স্থানে একটী বাঁধ দিতে হয়। জোয়ারের জল ক্ষেত্রে উঠিবার জন্য একস্থানে ফাক রাখিতে হয়। পরে জোয়ারের সময় সেই জমী প্লাবিত হইয়া, ভাটার সময় সরিয়া যায়। তাহাতে সেই প্লাবিতক্ষেত্রে এক প্রকার পলি পড়ে এবং বাঁধের ক্রোড়ে কিছু জলও আবদ্ধ থাকে। সেই পলিমিশ্রিত লোণাজল উঠাইয়া পাক করিলে উত্তম লবণ জন্মে। * * * এইরূপে ৩৪ বৎসর ক্রমিক লবণ জন্মিলে ক্রমে সেই লবণক্ষেত্র সোরা হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাতে আর উত্তম ও প্রচুর লবণ জন্মে না। উক্তরূপে লবণের জমী যখন সোরা হয় তখন তাহাতে ধান্য রোপণ করিলে উত্তম ও প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। সেই জমীতে ধান্য কি বিবিধ তৃণ উৎপাদন করিয়া শীতকালে যখন তাহা শুষ্ক হইয়া আসিবেক, তখন তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে সেই সকল ধান্যের পল ও তৃণ সকল দগ্ধ হইতে থাকিবেক। পরে সেই দগ্ধ লবণক্ষেত্রের স্থানে স্থানে স্তূপে স্তূপে এক প্রকার শ্বেত স্বচ্ছ পদার্থ পাওয়া যাইবেক। সেই শ্বেত ও স্বচ্ছ পদার্থ সকল কাচ। এই কাচ নিতান্ত মন্দ নহে। পূর্ব্বে এদেশে এই প্রণালীতেই কাচ জন্মিত এবং এই প্রণালীর কাচের দ্বারাই পূর্ব্বে এদেশে আদর্শাদি ব্যবহার্য্য বস্তুসকল প্রস্তুত হইত। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, বিলাতী কাচ অপেক্ষা দেশীয় কাচসকল শীঘ্র দাবী অর্থাৎ শীঘ্রই গলিয়া যায়, কিন্তু শীতল অবস্থায় অতি কঠিন হয়। এই ঔষধিক কাচসকল পরিষ্কারের দ্বারা পরিষ্কৃত হইলে সমধিক স্বচ্ছ হইতে পারে। এতদ্রূপ বিধানে কাচের জমী প্রস্তুত করিতে যে যৎসামান্য ব্যয় হয়, তাহা ধান্যবিক্রয়দ্বারা পরিপূর্ত্ত হয়, কাচগুলি লাভ থাকে। একবিঘা জমীতে অনূন ৫ পাঁচ মোন কাচ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এদেশে যদি কাচ ও কাচের পাত্র প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে ক্রমে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়া তদ্দ্বারা যথেষ্ট অর্থাগম হইতে পারে।" অবশেষে লেখক বলিয়াছেন যে আচ্, বকম, কুসুম প্রভৃতির চাষ সহজ ও লভ্যজনক। তুলা, নীল প্রভৃতির চাষের কথাও বলা হইয়াছে। বাক্যে সকলই আমাদিগের আছে, কিন্তু কার্য্যের সময় কিছুই দেখা যায় না—ঔষধি আছে রোগ শান্তি করিতে জানি না।

৬। সামুদ্রিক তত্ত্ব— শ্রীতারিণী চরণ নিয়োগী। যে বিজ্ঞানবলে অন্তরের অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বিশদরূপে অনুমিত হয় তাহাকে সামুদ্রিক শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া লেখক ইহার ঐতিহাসিক উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন। ইহার অনেক শাখা আছে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া উপযুক্ত উপদেশকের নিকট শিক্ষা

করিয়া লেখক এই শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন।

৭। জিজ্ঞাসা ও উত্তর। পারদর্শিহীন দর্পণ প্রস্তুত করিতে গিয়া নিষ্ফল হইয়া জনৈক পাঠকের প্রশ্ন ও সম্পাদকের উত্তর।

৮। সংক্ষিপ্ত সমালোচন। (১) অষ্টাঙ্গ হৃদয়. (২) ভার্গববিজয়-কাব্য।

সহচরী নাম্নী পরিশিষ্টে 'মধুযামিনী' (শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী) ও 'দেওয়ান গোবিন্দ রাম' নামে দুইটী উপন্যাসের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ এবং 'প্রকৃতি' (শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ও 'শোকোচ্ছ্বাস' (শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়) নামে দুইটী পদ্য আছে। তদ্ভিন্ন আর্য্যোন্নতি সভার (অদ্ভুত) নগর কীর্ত্তনের ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে।

আর্য্যদর্শন—পৌষ ও মাঘ, ১২৯০।
৯ম খণ্ড—৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অনেক দিনের পর একবারে দুই সংখ্যা আর্য্যদর্শন পাওয়া গেল। এই পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে বাহির হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। আর্য্যদর্শনের উন্নতি বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই।

১। বোম্বাইয়ের পারসী সম্প্রদায়। (শ্রী-যোগেন্দ্র—)। এই সংখ্যায় প্রবন্ধটী সমাপ্ত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা এ সংখ্যার প্রধান বিবেচিত বিষয়।

২। তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা। এটী একটী দীর্ঘ (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) প্রবন্ধ। এবারে যত দূর প্রকাশ হইয়াছে তাহার স্থূলমর্ম্ম এই—যেমন আলোকের অসৎ অন্ধকার, তেমনই আস্তিকতার অসৎ নাস্তিকতা। জ্ঞানের দ্বারা এই অসতের খণ্ডন হইয়া সৎ প্রকাশিত হয়। তর্ক ও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপিত হইতে পারে না, ঈশ্বর কেবল সভক্তিচেষ্টাদ্বারাই অনুভূত এবং কার্য্য যোগে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। নাস্তিকতা দুই প্রকার—ইচ্ছায় ও বিপাকে। উভয়ই প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে। জ্ঞান ও ধর্ম্মে মনুষ্যের তদভাবে পশুত্ব। নাস্তিকেরা যে সুখ অনুসন্ধান করেন, তাহা প্রকৃত সুখ নহে, কর্ত্তব্যসাধনই প্রকৃত সুখের ভিত্তি। যে সময়ের নাস্তিকতার বিষয় আলোচিত হইতেছে, তখন আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই আংশিক দেবতত্ত্ব এবং আংশিক জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ী। গ্রীকের নাস্তিক শিরোমণি এপিকুরস, হিন্দুর চার্ব্বাক। গ্রীকদেশে তত্ত্ববিদ্যায় আরিষ্টিপুসের সময় হইতে নাস্তিকতা দৃষ্ট হয়। ইনি প্লেটোর সম-সাময়িক লোক, পূর্ব্বে সক্রেটিসের নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করেন। ইঁহার মতে, যে উপায়েই হউক না, সুখ বা প্রমোদলাভই মনুষ্যের উদ্দেশ্য। ইনি অতি কুতার্কিক ছিলেন, কুতর্কযোগে অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ বলিয়া বুঝাইতেন। এবিষয়ে ইঁহার শিষ্য থিওডোরস আরও পণ্ডিত। আরিষ্টিপুসের শিক্ষায় 'ন্যায়', 'যশ', 'অযশ' বলিয়া বস্তুতঃ কিছুই নাই। থিওডোরসপ্রমুখ আরিষ্টিপুসের নাস্তিকসম্প্রদায়ের মত এই যে, সুখ এবং দুঃখ এই দুইটী মুখ্যবস্তু। সুখ জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয় এবং অজ্ঞান হইতে দুঃখ প্রবর্ত্তিত হয়। বন্ধুত্ব বলিয়া কোন পদার্থই নাই, কারণ কার্য্যোদ্ধার হইলেই বন্ধুত্বের কারণ লোপ হইল। বিজ্ঞতা প্রধান আচরণীয় গুণ। যে জ্ঞানী, সে কখন স্বদেশপ্রিয় হইয়া পরের জন্য প্রাণ দিতে যায় না। জ্ঞানীরা সমাজকে লুকাইয়া সকল কুকর্ম্মই করিতে পারেন—

কেননা সদসদ্ কেবল চলিত রীতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আরিষ্টিপুসের সম্প্রদায় ব্যতীত ইউক্লিড ও রিওন প্রভৃতি আরও বহুতর নাস্তিকতত্ত্ববিদ্ ও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

৩। সমরস্থেখর—উপন্যাস।

৪। রাজ অভ্যর্থনা—লর্ড্ রিপনের কলিকাতা আগমনে পদ্য।

৫। মৃচ্ছকটিক ও তদুল্লিখিত আচার ব্যবহার। (শ্রীপ্রসন্ন—)। এ প্রকার প্রবন্ধের সারসঙ্কলন ফলপ্রদ নহে।—প্রবন্ধটীতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের আদর করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে সুখপাঠ্য।

৬। বাল্যবিবাহ। (শ্রীশ—)। "মানব তত্ত্ব" গ্রন্থে ও ১২৮৯ সালের চৈত্রমাসের বঙ্গদর্শনে "বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য" নামক প্রস্তাবে বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিচার।

৭। সংগীতযোগ। (শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম)। যোগের সহিত সংগীতের তুলনা প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে স্বরের কথা প্রকাশিত হইয়াছে, এবারে কিঞ্চিৎ রাগের কথা আছে।

৮। ওয়ালেস।

৯। উনবিংশ শতাব্দী ও কলিযুগ। যে স্রোত বহিতেছে, লেখক বলেন, ইহার জন্ম ইংলণ্ডে, মিল ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহার উৎপত্তিস্থান, উনবিংশ শতাব্দী ইহার জন্মদিন। স্রোতের প্রবল তেজে স্পেন্সর, হার্বিসন প্রভৃতিকেও ভাসিতে দেখিয়া জিভনস্, ক্যাননবরি, বিশপ-বটলার, প্রফেসর কামাস, প্রেসিডেণ্ট ড্যানিয়েল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মিলের মীমাংসার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন।

১০। অজড় জড় ও জড় অজড় হওয়া। (শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম)। আর্য্যশাস্ত্র হইতে লেখক দেখাইয়াছেন যে, জড় অজড় এবং অজড় জড় হইতে পারে। মনুষ্যও কর্ম্মগুণে বা দোষে এই নিয়মের অন্তর্ভূত। ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীতে বিজ্ঞানের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

১১। আর্য্যবীর—মহারাণা রাজসিংহ। (শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়)।

১২। ভারত বৃত্তান্ত—কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। প্রথমসর্গ—মৎস্যগন্ধা।

ভারতী—চৈত্র, ১২৯০। ৭ম ভাগ —১২শ সংখ্যা।

ভারতীর সপ্তম বৎসর শেষ হইল। অনেক আবশ্যকীয় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইলেও এ বৎসর কয়েকটী অসার প্রবন্ধও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ভারতীর ন্যায় উচ্চশ্রেণীর পত্রিকায় তাহাদিগের স্থান হওয়া উচিত ছিল না বোধ করিয়াই আমরা এ কথা বলিলাম। "অকাল কুষ্মাণ্ড" নামক প্রবন্ধে যে সকল বিষয় পরিহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদিগকেই আবার মস্তকে ধারণ করা কি ভাল দেখায়?

১২শ সংখ্যার আলোচ্য বিষয়—

১। অকাল কুষ্মাণ্ড। (শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর)।

২। যোগতত্ত্ব। (শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ)।

৩। স্থান মান।

৪। লীলা—উপন্যাস।

৫। বিবিধ প্রসঙ্গ—ধর্ম্ম।

৬। ভাউসাহেবের বখর।

প্রথম ও পঞ্চমটী ব্যতীত অবশিষ্টগুলি পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ প্রসঙ্গে ধর্ম্মের বিষয় মন্দ বলা হয় নাই— আমরা একটু উদ্ধৃত করিলাম।—

"* * * এ জগতে স্বার্থপর হইবার যো নাই। পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম, পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। জগতের ধর্ম্ম আমাদিগকে আগে হইতেই পরের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা জগতের জড়াদপি জড়ের সমতুল্য। কিন্তু আমরা যখন স্বেচ্ছায় সচেতনে সেই মহাধর্ম্মের অনুগমন করি তখনই আমাদের মহত্ব, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ সুখলাভ করি। তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, স্বার্থপরতায় সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া তাহার স্থানে অতি ক্ষুদ্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কিন্তু পারিব কেন? অহর্নিশ অশান্তি, অসুখ, হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার আরাম থাকে না। যতই সে উপার্জ্জন করিতে থাকে, যতই সে সঞ্চয় করিতে থাকে, ততই তাহার ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে মাত্র। কিন্তু যখনই আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করি, তখনই দেখি সুখের সীমা নাই। তখনই সহসা অনুভব করিতে থাকি, সমস্ত জগৎ আমার স্বপক্ষে। আমি ছিলাম ক্ষুদ্র, হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র সূর্য্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।,

জগত স্রোতে ভেসে চল
যে যথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবি শশি
চলরে সেথা যাই।"

প্রবাহ—চৈত্র, ১২৯০। ২য় ভাগ; —১২শ সংখ্যা।

১। বিদ্যুল্লতা—উপন্যাস। (শ্রীযুক্ত জয়চাঁদ)।

২। স্বাধীনতা, সাম্য, সাম্প্রদায়িকতা। (শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায়)। সাম্যনীতি অবলম্বন করিতে হইলে শাসনব্যাপারও সমাজের হস্তে রাখিতে হয়, কেননা যেখানে সাম্য সেইখানেই স্বাধীনতা। আর মনুষ্য এক মতের বশবর্ত্তী হইলেই ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হইবে। লেখক দেখাইয়াছেন যে, স্বাধীনতা, সাম্য ও সাম্প্রদায়িকতা এই তিনটী উচ্চ ও উদারনীতির সাম্যই মূলমন্ত্র; কিন্তু সেই সাম্যনীতি সম্যকরূপে অবলম্বিত হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার মতে বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় শাসন প্রণালীতে এই তিনটী মতের অনেক সামঞ্জস্য হইয়াছে এবং তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন যে রাজপুরুষেরা আমাদিগকে সমাবস্থায় লইয়া যাউন। লেখকের প্রার্থনা পূর্ণ হয়, তাহাতে, বোধ হয়, কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু কাহার কাছে কিসের প্রার্থনা?—দৈববিশ্বাসী জাতির দৈবেই নির্ভর আর স্বার্থপর জাতির স্বার্থরক্ষাই ধর্ম্ম!

৩। শৈশব-মৃত্যু ও পীড়া। (শ্রীযুক্ত সার্জ্জন ধর্ম্মদাস বসু, এল, আর, সি, পি; এল, আর, সি, এস)। বাল্যাবস্থায় ও যৌবনের প্রারম্ভে কি উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, এক্ষণে তাহার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষা ও বিবাহ এই দুইটী স্বাস্থ্যের হানি করিয়া থাকে। জ্ঞান, নীতি, ও ব্যায়াম, এই ত্রিবিধ শিক্ষার সামঞ্জস্য না হইলে উন্নতি নাই। লেখক দেখাইয়াছেন যে, এ দেশে শিক্ষার প্রণালী

ভাল নহে এবং বিদ্যালযের নিযমাবলী স্বাস্থ্যহানিকর। তাঁহার মতে গৃহে মাতার নিকট শিক্ষালাভ প্রথমাবস্থায় বালকের বিশেষ উপযোগী।

৪। ন্যায় দর্শন। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র শিরোমণি)।

৫। বৎসরান্তে—পদ্য। (শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দাস)।

৬। ভারতে চীনদেশীয় বৌদ্ধ পর্য্যটক। (শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গঙ্গোপাধ্যায)। সমস্ত চীনরাজা ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় উৎপন্ন হইল। এই সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীন পণ্ডিতেরা ঐ ধর্ম্মের মূলনীতি নিরূপণ করিবার জন্য ভারতে আগমন করেন। চি তা-ওন প্রথমে আসেন, তৎপরে ফা-হিযান, তৎপরে হোই সেঙ্ ও সঙ-ইযুন এবং ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে হিউ এন্-থসঙ্গ এ দেশে আগমন করেন। এ সংখ্যায় ফা-হিযানের ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া হিউ-এন-থসঙ্গ লিখিত বৃত্তান্ত হইতে ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা আলোচিত হইযাছে। ইহাতে গযা নগরীর অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

৭। পাট। (শ্রীযুক্ত কৃষিজীবি)। পূর্ব্ব সংখ্যায় বণিক লিখিত 'পাট' নামক প্রবন্ধে পাটের চাষ সম্বন্ধে যে সকল বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যত অধিক আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। এই আলোচনায লোকের শিক্ষা হয ইহাও বাঞ্ছনীয়।

৮। কলিকাতা অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। (শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর সিদ্ধান্ত)। সিদ্ধান্ত মহাশয যথাযথ দেখাইযাছেন যে, প্রদর্শনীর ব্যাপারটা সমস্তই পণ্ড হইয়াছে। তাঁহার মত আমাদিগের মতের সহিত প্রায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়াছে দেশীয় দর্শকদিগের প্রতি উচিত ব্যবহার করিলে (প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সকল না হইলেও) জুবেযার সাহেবের ক্ষতি হইত না। বিস্তর জাতীয় ধন বৃথা নষ্ট হইযাছে এবং কতকগুলি লোকের মযঃসল হইতে কষ্টভোগ করিযা মেলা দেখিতে যাইবার (অপমান ক্রয করিযা প্রতারিত হইবার) ঋণ আজিও শোধ হয় নাই।

৯। গ্রন্থাদির উল্লেখ ইত্যাদি।

প্রবাহ দ্বিতীয় বৎসর অতিক্রম করিল। বিশেষ আনন্দের সহিত আমরা ইহার গতি লক্ষ্য করিযাছি; ইহার এক একটী তরঙ্গ বেশ নির্ম্মল ও সতেজ। কিন্তু প্রবাহসম্পাদকের আরও একটু অনুদারভাবে প্রবন্ধসকল মনোনীত করা কর্ত্তব্য, নতুবা অসার প্রবন্ধ প্রকাশ করিলে নিজের ও বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইবে না। আগামী বৎসর হইতে প্রবাহের কলেবর ক্ষুদ্র হইবে শুনিয়া আমরা একটু দুঃখিত হইলাম। আমাদের সাময়িক সাহিত্য 'কলি' হইতে 'সত্য'যুগে যায় ইহাই বাঞ্ছনীয। অতএব 'প্রবাহের কলেবর'বৃহৎ হইলেই ভাল হইত। কিন্তু তাহা না হইযা ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে চলিল। যাহা হউক আকারে ক্ষুদ্র হইয়াও যদি অধিক মূল্যবান সামগ্রী বহন করে তবেই এক্ষণ সুখের বিষয়। বলা বাহুল্য যে এক জাহাজ পয়সা অপেক্ষা একখণ্ড হীরক নিজের গুনেই বহুমূল্য।

মাস-সমালোচন।

[এই পত্রের 'মাস সমালোচন' এবং 'সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হয়, অতএব বিষয়বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।]

প্রবল প্রতাপান্বিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া 'ইংরাজস্বার্থ সংরক্ষিণী' সভার সভ্যগণ আজকাল বড়ই উল্লসিত। যেরূপ দাম্ভিকতার সহিত তাহারা সেই উল্লাস সাধারণে প্রকাশ এবং প্রচার করিতেছেন, তাহা দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতার জন্য মনে লজ্জা ও ঘৃণার যুগপৎ উদ্রেক হয়। মহামহিম কেসুইক্‌সাহেব যুদ্ধের ক্লান্তিনিবারণ-অভিপ্রায়ে গত মাসে আসাম-পরিভ্রমণে যাইয়া, তথায় যোড়শোপচারে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পদার্পণজনিত জয়ধ্বনিতে সমগ্র আসাম এখনও পরিপূর্ণ। শ্মশানিক প্রেতধ্বনি যতই শুনিতেছি, ততই দেহপ্রাণ লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বিস্ফোটকের উপর আবার সর্পাঘাত,—দেশীয় জমিদার মহাপ্রভুদিগের কেহ কেহ কেসুইক ও তৎপ্রমুখ ইংরাজদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া জন্মভূমির প্রেতকৃত্য সমাপন করিতেছেন! হা ধিক্! এ দেশ হইতে মনুষ্যত্ব কি একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে!

পূর্ব্বে আমরা একবার বলিয়াছিলাম যে, যদিও কয়েকজন ইংরাজকর্ত্তৃক ইল্‌বার্ট-বিলের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে, তথাপি উক্ত বিলসংসৃষ্ট আন্দোলনে আমাদের অনেক উপকার হইবে। এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ঐ আন্দোলনের জন্য, বিজাতীয় অনেকগুলি মহানুভব ইংরাজের দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পতিত হইয়াছে। তাঁহারা আজকাল ভারত-শাসনকার্য্য কি প্রকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং ইহার অধিবাসিদিগের প্রকৃত অবস্থা কি, ইত্যাদি কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় কথা লইয়া বিশেষ আলোচনা ও আন্দোলন করিতেছেন। পার্লিয়ামেণ্টের প্রসিদ্ধনামা সভ্য মিঃ স্ল্যাগ এই আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী। ইনি এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিলাতে ভারতবর্ষীয় ষ্টেট সেক্রেটারির অধীনস্থ যে সভা আছে, তাহা একবারে উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে মহাসভার কয়েকজন সভ্যকে লইয়া একটী চিরস্থায়ী সভা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শীঘ্রই মহাসভায় একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। বর্ত্তমান ইণ্ডিয়া কাউন্‌সিলের অস্তিত্ব হেতু ষ্টেট্ সেক্রেটারির কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, কারণ উক্ত কাউন্‌সিলের অধিকাংশ মেম্বর ভারতবর্ষপ্রত্যাগত সিভিলিয়ানদিগের মধ্য হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন, এবং উক্ত কর্ম্মচারিগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সর্ব্ববিষয়ে এরূপ সংসৃষ্ট এবং সমস্বার্থাপন্ন, যে তাঁহারা কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ও ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহা করেন, তাঁহারা তাহা স্বার্থানুরোধে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতে বাধ্য হন। উক্ত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি এবং সংস্রব এতদূর প্রবল যে, তৎকৃত অপরাধমাত্রই তাঁহারা গোপন ও সমর্থন করেন। তাঁহাদের অভেদ্য ব্যূহমধ্যে অপর কেহ কখন প্রবেশ করিতে পারেন না। অবশ্য প্রতি পঞ্চমবৎসরে এক এক জন নূতন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইবার

প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু যখন রাজত্বের সমস্ত বিভাগ এবং উপবিভাগের ক্ষমতা সর্ব্বতোভাবে সিভিলিয়ান্ কর্ম্মচারিসম্প্রদায়ের হস্তগত, তখন হঠাৎ একজন নূতন গবর্ণর জেনারেল আসিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তিনি রাজার স্বাধীনচেতা হউন, তাঁহার অধীনস্থ সমগ্র কর্ম্মচারিমণ্ডলীর কথা কিছুতেই তিনি অবহেলা করিতে সমর্থ হন না। লর্ড রিপনের শাসন এ কথার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল।

সিভিলিয়ানেরা ভারতরাজত্বের প্রারম্ভ হইতে সকল প্রকার ক্ষমতা নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন; এখন প্রাণান্তেও সেই সকল ক্ষমতার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহেন। দেশের মঙ্গল হউক আর অমঙ্গল হউক, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু যে বন্দোবস্তে 'পিতাপিতামহ কাটাইয়া' গিয়াছেন তাহা সাব্যস্ত এবং অপ্রতিহত থাকা চাহি। ইহাতে যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহাকে নিপাত হইতে হইবে! অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে যখন এরূপ ষড়যন্ত্র, তখন একা গবর্ণর জেনারেল কি করিতে পারেন? তারপর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যকলাপই বিলাতে মঞ্জুর হইয়া থাকে; সেখানে ষ্টেট্ সেক্রেটারি এবং তাঁহার কাউনসিল সর্ব্বময় কর্ত্তা। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা সর্ব্বোপরে বিরাজ করিতেছেন বটে; কিন্তু ষ্টেট সেক্রেটারির কাউনসিল উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় কোন কথাই ততদূর পঁহুছিতে পারে না। সুতরাং সেই কাউনসিলই আমাদের সর্ব্বোচ্চ আপীল আদালত। কিন্তু সেখানেও সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রবল প্রতাপান্বিত সিভিলিয়ান মহাপুরুষদিগের একাধিপত্য।

ভারতবর্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ঠিক এইরূপ প্রণালীতেই শাসনকার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে, এবং ইংরাজ শাসনের সহস্র গুণ সত্ত্বেও যে তদ্দ্বারা ভারতবাসীর নানাপ্রকার কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, প্রাগুক্ত শাসনপ্রণালীই তাহার একমাত্র মূলীভূত কারণ। যাহা হউক ইলবার্ট বিল সংসৃষ্ট আন্দোলনে যে অবশেষে ইংলণ্ডবাসিদিগের চক্ষু ভারতের উপর নিপতিত হইয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে অতি সৌভাগ্যের কথা। এক্ষণে মিঃ স্যাগ এবং তাঁহার সহযোগিগণ সফলমনোরথ হয়েন, ইহাই ভারতবাসীর ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বিলাতে আমাদের পক্ষে একটু একটু অনুকূল 'হাওয়া' বহিতে আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশের ধনী, মানী এবং শিক্ষিত লোকদিগের আচরণ দেখিয়া আমরা নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িতেছি। কোথায় এখন আমরা আমাদের বিলাতস্থ শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিব; কিন্তু তাহা না করিয়া, আমরা দিন দিন তাহার ঠিক বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোথায় সমস্ত দল ভাঙ্গিয়া একটী দল করিব, দেশবাসিদিগকে একটী সম্প্রদায়ভুক্ত করিব, তাহা না করিয়া আমরা ক্রমশঃ আমাদিগের মধ্যে দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছি। প্রজা জমিদার দুই দল ছিল, আবার তাহার উপর সম্প্রতি আরও দুইটী অভিনব দলসৃষ্টির জন্য দুইটী নূতন রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপ নূতন নূতন দল হইলে যে আমাদের জাতীয় বল ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, ইহা কি কেহ বুঝিবেন না? ভারত পতিত; তাহার উদ্ধারসাধন করিতে হইবে; এ কথা আমরা

সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিসে যে সে মহৎকার্য্য সংসাধিত হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের একটী স্থায়ী মত নাই। নূতন নূতন কথা এবং প্রস্তাব অনবরত উঠিতেছে, সভা এবং বক্তৃতারও অসদ্ভাব নাই, কিন্তু কাযে ত কিছুই দেখি না। অস্থিরমতি, এবং সকলেই আপনাপন মত সাব্যস্ত রাখিতে বদ্ধপরিকর। সকলে মিলিয়া যে একমত এবং এক অভিপ্রায়ে কার্য্য করিব, তাহা কিছুতেই হইবে না। প্রকৃত নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষিতা এপর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মে নাই, এবং কবে যে জন্মিবে, তাহা ঈশ্বরই বলিতে পারেন।

গত মাসের রাজকীয় ব্যাপারের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। লর্ড রিপনের সিমলা যাত্রা।—ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার একটী চিরস্মরণীয় সেশন সমাপ্ত করিয়া লর্ড রিপন গত মাসে সিমলাযাত্রা করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রায় যাবতীয় কর্ম্মচারী তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন। যদিও গবর্ণমেণ্টের এই বাৎসরিক সিমলাপ্রবাস সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, এবং সকলেই যথাসাধ্য রবারব এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়া থাকে, তথাপি দেখা যাইতেছে যে, ইহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ক্রমশঃ একটী অলঙ্ঘনীয় প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতি বৎসরই প্রবাসগামী কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্টও সিমলা স্থানটিকে চিরস্থায়ীরূপে বাসোপযোগী করিবার জন্য অনেক অর্থব্যয় করিয়া অট্টালিকাদিতে সুশোভিত করিতেছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রী এই সিমলাপ্রবাস তাহার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত, কারণ, সকলে একমতে একস্বরে ইহার জন্য প্রতিবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট একবারেই তাহা গ্রাহ্য করেন না। কয়েক মাসাবধি গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার পর রাজকর্ম্মচারীরা কিছুকালের জন্য অবসরসম্ভোগ এবং শৈলবিহার করেন, তাহাতে অবশ্য আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সমগ্র গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া এইরূপে সুদূর হিমালয়শিখরে প্রবাসগত হইলে প্রজালোকের নাকি বাস্তবিকই অনেক বিষয়ে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতেই আমরা সাধারণ প্রতিবাদে যোগ না দিয়া থাকিতে পারি না। যে কয়েক মাস এই প্রবাস স্থায়ী হয়, সে কয়েক মাস সমস্ত দেশের শাসনযন্ত্র যে কি পরিমাণে শিথিল হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। বাস্তবিক্য চলিতে থাকে বটে, কিন্তু যাহা 'নহিলে নয়' তাহাই হয় আর শত সহস্র প্রকার যে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য তাহা সর্ব্বতোভাবে 'আগামী' সেশনের জন্য রক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন কোন একটা বৃহৎ কার্য্য হস্তে থাকিলেও, তাহাকে অসম্পন্ন এবং অসম্পূর্ণাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করা হয় না। ইহাতে অনেক সময়ে রাজ্যের অনেক অমঙ্গল সংঘটিত হয়। তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল—ইলবার্ট বিল-সম্বন্ধীয় শোচনীয় আন্দোলন। আইনের প্রস্তাব করিয়াই গবর্ণর জেনরেল বাহাদুর সদলবলে পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিলেন; এদিকে রাজ্যমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কথার উপর কথা বাড়িতে লাগিল,

প্রজায় প্রজায় ক্রমশঃ প্রবল কলহ বাঁধিয়া উঠিল, প্রথমে মুখোমুখি, অবশেষে হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইবার উপক্রম হইল। অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিন্দাবাদ ও অন্যায় দোষারোপ ইত্যাদিরও সীমা পরিসীমা থাকিল না। কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে, যদি ইলবার্ট্ বিলের সূচনা করিয়াই গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভূমি পরিত্যাগ না করিতেন, এবং উপস্থিত থাকিয়া প্রজাসাধারণকে তাহার ঔচিত্যানুচিত্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে সেই ভয়ানক শোচনীয় সামাজিক অনর্থ কখনই ঘটিত না, এবং গবর্ণমেণ্টকেও সহস্র লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অবশেষে এরূপ অপদস্থ হইতে হইত না। গবর্ণমেণ্টের এই সিমলাপ্রবাস যে দেশের মঙ্গলের পক্ষে একটী প্রধান অন্তরায়, তাহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে তাহার আবশ্যকতা নাই। তবে সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন কখন এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে ত্রুটী না করেন। দেশের সর্ব্ববাদিসম্মত প্রতিবাদ যে চিরকালই সমভাবে উপেক্ষিত হইতে থাকিবে, তাহার অর্থ কি?

২। বজেট—সিমলা যাত্রার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত করিয়াছেন। রাজস্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব না থাকায়, ব্যবস্থাপক সভায় "পেশ" না হইয়া বজেটটী এবৎসর কেবলমাত্র একটী হিসাবের আকারে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বৎসরে যাহা কিছু করেন, তন্মধ্যে এই বজেট সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ইহা হইতেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা এবং রাজ্যের আর্থিক রহস্য অবগত হওয়া যায়, এবং ইহার ভাল মন্দের উপরই প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহার ন্যায্যান্যায্য সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের মতামতের প্রতি লক্ষ্য করেন না। বজেট গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইল, এবং কতকগুলা কৈফিয়তের সহিত শত সহস্র তালিকাকারে একদিন হঠাৎ গেজেটে ছাপা হইল, ন্যায় কি অন্যায় হইল তাহা কে দেখে এবং কে শুনে। গবর্ণমেণ্ট একটী মহৎ দায়ে খালাস হইয়া, তাড়াতাড়ি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সিমলা গমন করিলেন। আমাদের বিবেচনায়, সিমলাযাত্রার অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে বজেট প্রকাশিত হওয়া উচিত, এবং তৎসম্বন্ধে সাধারণের মতামত গ্রহণ করিয়া তাহাকে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন কিম্বা সংশোধন করা উচিত। যে কলম "ডালিলাম" তাহাই যদি অব্যর্থ হয়, তাহার উপর যদি প্রজাসাধারণের কোন প্রকার বাক্যস্ফূর্ত্তির অধিকার কিম্বা প্রয়োজন না থাকে, তবে আর বৃথা সাধারণ অর্থ নষ্ট করিয়া ছাপাইবার আবশ্যকতা কি? মনে মনে যাহা আছে, তাহা করিলেই ত হয়!

যেরূপ শত সহস্র তালিকার সহিত বজেট প্রকাশিত হয়, তাহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। এত আয়, এত ব্যয়, এত ফাজিল কিম্বা এত বাকি; সাধারণতঃ এইরূপভাবেই সংবাদপত্রে বজেটের সমালোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা যেরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহাতে আমরা বিবেচনা করি, যে ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলি যাহাতে সর্ব্ব সাধারণের উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম

হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এই পত্রের দ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব নহে। আশা করি, দেশীয় সংবাদপত্রসকল এ বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিবেন। রাজ্যের বাৎসরিক আয়ব্যয়সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কথা যত দিন না সাধারণে বুঝিবে, ততদিন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপে কিছুতেই তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি জন্মিবে না।

৩। সালেম কাহিনী।—গত মাসে এই শোচনীয় কাহিনীর আর এক অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এ অধ্যায়ে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের 'আপ্তকথা',—প্রজবাৎসল্য ও ন্যায়পরতার অনুপম ভাষ্য। সমগ্র বিষয়টীর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সালেম মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উক্ত নামধেয় জেলার রাজধানী, এবং একটী বেশ বর্দ্ধিষ্ণু সহর। তথায় অনেকগুলি হিন্দু এবং মুসলমানের বাস। অদ্য বৎসরাধিক হইল, প্রথমে একটী মসজিদ লইয়া হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে কলহ আরম্ভ হয়। সেই কলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া ভয়ানক আকার ধারণ করে। অবশেষে পরস্পরের মধ্যে এরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হয় যে, মান্দ্রাজ হইতে সৈন্য লইয়া আসিয়া সহরের শান্তিরক্ষা করিতে হইয়াছিল। হাঙ্গামার প্রারম্ভেই উভয় পক্ষেরই অনেক লোকজন মারা পড়ে, এবং সহরের মধ্যে অনেক গৃহ, দোকান, মন্দির এবং মসজিদ বিনষ্ট হয়। এক্ষণে ক্রমশঃ জানিতে পারা যাইতেছে যে, 'আল্লা গোড়া' গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিদিগের অন যথামতাবশতই এই সমস্ত ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সহরের সম্ভ্রান্ত হিন্দু অধিবাসীরা পূর্ব্ব হইতেই দাঙ্গা নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন, এবং গবর্ণমেণ্টকেও পুনঃ পুনঃ এ সম্বন্ধে সাবধান হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যে সময়ে দাঙ্গা হয়, সালেমের মাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকলিন সাহেব ব্যাঙ্গালোরে ঘোড়দৌড়ের আমোদে মত্ত ছিলেন। পরন্তু আপন কর্ম্মচারিদিগের দোষ এবং অনবধানতা সম্বন্ধে কোন প্রকার তদন্ত না করিয়া দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট সালেমের সমগ্র হিন্দু অধিবাসিদিগের উপর মকদ্দমা চালাইবার হুকুম দেন। এই মকদ্দমার তদন্ত তদ্বির ও বিচার করিবার জন্য মিঃ ম্যাকাইভার নামক জনৈক যুবা সিভিলিয়ান, বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া সালেমে গমন করেন। তিনি যেরূপ ভয়ানক অত্যাচারের সহিত তদন্ত এবং বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কয়েক মার পর্য্যন্ত তাঁহার উৎপীড়নাতিশয্যে সহরের সমস্ত ভদ্র এবং সম্ভ্রান্তলোকদিগকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। বেতনভোগী গুপ্তচর এবং প্রেতস্বভাব পুলিস কর্ম্মচারিগণ সমস্ত সহর আলোড়িত বিলোড়িত করে এবং অবশেষে বাছিয়া বাছিয়া প্রত্যেক সহরের ভদ্র এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ম্যাকাইভারের যমালয় সদৃশ আদালতে লইয়া যায়। ম্যাকাইভার সকলকেই সেশন আদালতে সমর্পন করেন। সেশন আদালতেও একজন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জজ আসিয়া মকদ্দমার বিচার করেন। জজ সাহেব অধিকাংশ লোককেই শাস্তি প্রদান করেন; এবং তাঁহার অনুকম্পায়, সালেমের অনেকগুলি শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোক অদ্য স্ত্রীপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া সুদূর সাগরগর্ভস্থ আন্দামান দ্বীপে যাবজ্জীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। যে কয়েকজন আসেসর জজসাহেবের সঙ্গে এই মকদ্দমা করিবার জন্য বিচারাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহারা সকলেই এক-বাক্যে অভিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হয় নাই সেশন আদালতের বিচার সমাপ্ত হইলে, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা মান্দ্রাজ হাইকোর্টে আপীল করেন। এই সময়ে এই মকদ্দমা সম্বন্ধে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আচরণ করেন, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মান্দ্রাজের এথিনিয়ম নামক ইংরাজী সম্বাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ঠিক এই সময়ে মিঃ ম্যাকাইভার (যিনি সর্ব্ব প্রথমে মকদ্দমার তদন্ত করেন) মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে এক আশ্চর্য্য পত্র লিখেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, হাইকোর্ট হইতে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের শাস্তি কমিয়া না যায়, তদভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট যেন হাইকোর্টের জজদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন! কাউনসিলের মেম্বর হইতে স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুর পর্য্যন্ত এই পত্র পাঠ করেন এবং তাহার পোষকতা করিয়া আপন আপন মন্তব্য লিখেন। সিভিলিয়ান-অধিকৃত ভারত-রাজ্যে শাসনসম্বন্ধে তলে তলে অনেক প্রকার কারখানা হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মান্দ্রাজ সিভিলিয়ানদিগের এই আচরণ (যাহা দৈবাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে) সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত। ম্যাকাইভারের ইচ্ছা ছিল যে, গবর্ণমেণ্ট কয়েকটা জজের গলা টিপিয়া তাহাদিগের দ্বারা আপন অভিপ্রায়মত হুকুম বাহির করিয়া লয়েন! কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও, হাইকোর্ট অভিযুক্ত অনেক ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়াছিলেন, এবং অনেকের শাস্তিও কমাইয়া দিয়াছিলেন। চারিজন জজের মধ্যে একজন আবার সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্দ্দোষী বলিয়া আপনার মত প্রকাশ করেন।

গত মাসে লর্ড রিপন যখন মান্দ্রাজ পরিদর্শন করিতে গমন করেন, তখন সালেমবাসী অষ্টসহস্র লোক একত্রিত হইয়া এই ভয়ানক অত্যাচার সম্বন্ধে তাঁহার নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রদান করে। দরখাস্তে অপরাপর সহস্র কথার মধ্যে এই কথা লিখিত ছিল যে, "এই মকদ্দমার জন্য সালেম সহর অদ্য সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত লোকশূন্য হইয়াছে। এবং সেই লোকেরা অদ্য বিনা দোষে আন্দামানদ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।" এই বলিয়া অধিবাসীরা লর্ডরিপন বাহাদুরের নিকট সুবিচার এবং দয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ধন্য ভারতবর্ষীয় সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র! এবং ধন্য ব্রিটিস শাসন-প্রণালী! লর্ডরিপন এই অষ্টসহস্র অনাথ, বন্ধুহীন, এবং শোকাকুল প্রজাবর্গের আবেদনের উত্তর দিয়াছেন যে, যখন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এবং মান্দ্রাজ হাইকোর্ট সমুচিত বিবেচনা এবং বিচার করিবার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছেন, তখন, ইহাতে আর তিনি কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ নহেন! কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই সালেমব্যাপারে যেরূপ ভয়ানক ও শোচনীয় অত্যাচার সাধিত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ দিন দিন তৎসম্বন্ধে যেরূপ নানাপ্রকার আশ্চর্য্যরহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অচিরাৎ লর্ড রিপনকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য

হইতে হইবে। তবে এখন আপনা হইতে হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহার মহত্ত্ব এবং সম্ভ্রম রক্ষিত হইত, ইহার পর আর তাহা হইতে পাইবে না। লর্ড বিপনের এক হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাঁহার অপরাপর সহস্র সদ্‌গুণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে!

৪। রুষকর্ত্তৃক মার্ভ অধিকার।—রুস মধ্য এসিয়াতে আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছে, এবং এ বিষয়ে অনেক দূর কৃতকার্য্য ও হইয়াছে। তাহার অগ্রগতি দেখিয়া ইংলণ্ড আর নিতান্ত উদাসীন হইয়া থাকিতে পারেন না, কেননা যে ভাবে সে অগ্রসর হইতেছে, সেই ভাব অপ্রতিহত থাকিলে সম্ভবতঃ আর ২০।২৫ বৎসর মধ্যেই ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। সম্প্রতি সে মার্ভ নগর অধিকার করিয়াছে এবং মার্ভস্থ সমস্ত টর্কোমান জাতিরা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। পূর্ব্বে যখন রুসিয়ার অধিকার আরও দূরে ছিল, তখন তাহার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য ইংলণ্ড অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন; উপর্য্যুপরি কয়েকবার আফগানিস্থানের সঙ্গে যে যুদ্ধকাণ্ড হইয়াছে, তাহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু এবারে মার্ভ অধিকৃত হইয়াছে শুনিয়াও যে ইংলণ্ড কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না, এই কথা লইয়া সভ্যজগতের অধিকাংশ দেশেই বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। আমরা ভারতবাসী, 'আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখি না'! কিন্তু আমরাও একটু বিস্মিত হইয়াছি। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় এই কথা উঠিয়াছিল; এবং এতৎসম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। বর্ত্তমান গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিসমিতি বলিতেছেন যে, তাঁহারা নিন্দিত নহেন মার্ভ অধিকৃত হইয়াছে, সম্পূর্ণ খবর তাঁহারা রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন চিন্তার কারণ নাই। যেহেতু রুসের সঙ্গে তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, এবং মধ্য এসিয়ায় রুষ এবং ইংলণ্ড এতদুভয়ের রাজত্বের একটী সীমা অতি শীঘ্রই স্থিরীকৃত হইবে। এরূপ বন্দোবস্ত হইবে যে, ভবিষ্যতে এই সীমা পরস্পর কেহই অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন না। একথা যে ঠিক তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন প্রযোজনীয়তা নাই; কিন্তু আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এরূপ বোধ হইতেছে, যে সীমাই নির্দ্দিষ্ট হউক, আর পাকাপাকি লেখাপড়াই হউক, মধ্য এসিয়াতে অনতিকালমধ্যেই একদিন ইংলণ্ড এবং রুষকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে।

এমন অবস্থায় আমরা আমাদের ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিই যে, তাঁহারা এই বেলা সময় থাকিতে ভারতবর্ষে আত্মপক্ষ বলীয়ান করুন। সমগ্র প্রজাবর্গের সন্তুষ্টিতে রাজার যেরূপ বলবৃদ্ধি হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। কান্দাহারে রেলওয়ে করুন, আর উত্তর-পশ্চিম সীমায় দুর্গই নির্ম্মাণ করুন, লক্ষ লক্ষ দুর্গ এবং কোটী কোটী দুর্গ রক্ষক থাকিতেও অনেক জাতি বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি সুধু ইহা না করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎসঙ্গে সঙ্গে আপন প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, এবং তাহাদিগের সুখসমৃদ্ধি যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের রাজত্ব চিরকালের জন্য অটল এবং অক্ষুণ্ণ থাকিবে। (হঃ)

নানা কথা।

সম্রাজ্ঞীর চতুর্থ পুত্র কুমার লিওপোল্ড ডিউক অব্ আলবানীর মৃত্যু সংবাদে আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। ভারতেশ্বরী বৃদ্ধাবস্থায় এই নিদারুণ শোক সন্তপ্তা হইয়াছেন শুনিয়া কে না ব্যথিত হইবেন। ডিউক অব্ আলবানী ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের ৭ই এপ্রিল বকিংহাম প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭২ অব্দের অক্স্ফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; এবং তাহার চারি বৎসর পরে D. C. L উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৮১ অব্দের মে মাসে তিনি "ডিউক অফ আলবানী" উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবৎসর ২৭শে এপ্রিল ওয়েল্স ডেক অধিপতির কন্যা রাজকুমারী ফ্রেড্রাকিা অগষ্টার পাণিগ্রহণ করেন। সম্প্রতি বিগত ২৮শে মার্চ্চ ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলস্থিত কেনিস নগরে অকালে পূর্ণযৌবনে দ্বাত্রিংশৎবর্ষমাত্র বয়ক্রমকালে সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহার অবিবাহিতাবস্থায় তাঁহাকে দেড়লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিবাহ হইলে আরও লক্ষ টাকা বৃত্তি বৃদ্ধি হয়। লিওপোলড্ স্বাভাবিক সরলতা ও অমায়িকতা গুণে ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকেরই প্রিয়পাত্র হইয়া ছিলেন। শিল্পবিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

হরিপাল হইতে জগদ্বল্লভপুর পর্য্যন্ত (১০ মাইল) একটী রেলওয়ে লাইনের প্রস্তাব করিয়া বাবু আদ্যনাথ মিত্র গবর্ণমেণ্ট, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, ও তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানীর নিকট একখানি আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদনের একখণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রস্তাবিত লাইনের আনুমানিক আয়ব্যয় সম্বন্ধে আদ্যনাথ বাবু যে 'এষ্টিমেট' দিয়াছেন, তাহা বিলক্ষণ যুক্তিসঙ্গত এবং লাইনটীর আবশ্যকতাও যথেষ্ট। আমরা আমরা আশা করি, রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এবিষয়ের যথাযথ বিবেচনা করিবেন। 'রেলওয়ে'বিস্তার সম্বন্ধে আজ কাল বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে এবং দেশের সর্ব্বত্র রেলপথ বিস্তার হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক তৎপক্ষেও আর বিশেষ মতভেদ নাই। অতএব যখন দেখা যাইতেছে যে আদ্যনাথ বাবুর প্রস্তাবিত লাইনটী কোন ক্রমে অলাভকর হইবে না, তখন তাহা উপেক্ষিত হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না। এক্ষণ এই প্রসঙ্গে আমাদিগের আর একটী কথাঃ—দেশীয় ধনিদিগের মধ্যে অনেকেই এখন বুঝিয়া থাকিবেন যে, রেলওয়ে-কার্য্য অলাভকর নহে, বরং অন্যান্য অনেক ব্যবসা হইতে অধিক লভ্যজনক; অতএব তাঁহারা কি জন্য অগ্রসর হইতেছেন না? দুই একটী ক্ষুদ্র লাইনের ভারগ্রহণ করিতেও কি তাঁহাদের সাহস হয় না। আমাদের সকল কাজই ইংরাজে করিয়া দিবে চিরকাল এই ভাবিয়া বসিয়া থাকা কি ভাল হইতেছে? বারান্তরে আমরা একথার পুনরায় আলোচনা করিব।

সম্রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়া প্রণীত নূতন পুস্তক (More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands from 1862 to 1882) প্রকাশিত হইতে না হইতেই তাহার দশহাজার কাপি বিক্রয় হয়, তারপর আরও পাঁচহাজার কাপি মুদ্রিত হইয়া, কিছুদিনের মধ্যে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এক্ষণ আরও অনেক পুস্তকের আবশ্যক। বাঙ্গালী গ্রন্থকারদিগের নিকট এই সংবাদটা বিস্ময়কর হইতে পারে কিন্তু ইংরাজ যেরূপ পুস্তকপ্রিয় জাতি তাহাতে সম্রাজ্ঞী কর্ত্তৃক লিখিত গ্রন্থের ২০। ২৫ হাজার কাঁপি অল্পদিনের মধ্যে 'কাটতি' হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

———

বিখ্যাত শিল্পী মিঃ আল্‌ফ্রেড হোন ভারতীয় শিল্পকার্য্যের উন্নতি সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যাঁহারা দেশীয় কারুকার্য্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা হোন সাহেবের কথাগুলিতে একটু মনোযোগ প্রদান করিলে লাভবান হইতে পারিবেন। ক্রমাগত বিদেশীয় 'আদর্শের' অনুসরণ করিলে দেশীয় কোন দ্রব্যই প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হইতে বা পূর্ণতালাভ করিতে পারে না; প্রত্যুত জারজতাসম্পন্ন ও অধঃপতিত হয়। চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্প সম্বন্ধেও অবশ্য এই নিয়ম প্রযুজ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সকল বিষয়ে বিদেশীয়দিগের ঐকান্তিক অনুকরণ করিতে আমরা অভিলাষী। এই অনুকরণের ফল কি দাঁড়াইতেছে তৎপ্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। কোন কার্য্যের ফলাফল বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করা আমাদের একটী রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে বলেন এ রোগের মূল ইংরেজী শিক্ষায়। আমরা বলি তাহা নহে, ইহার মূল আমাদের চরিত্রে। এই চরিত্রগত দোষ বিদূরিত না করিতে পারিলে আমাদের নিস্তার নাই। ইংরেজী শিক্ষা বা অনুকরণপ্রিয়তা মূলতঃ ইহাদের কিছুই দোষ নাই; দোষ আমাদের নিজের। যে দ্রব্যের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লাভ হইবার সম্ভাবনা, আবার সেই দ্রব্যের অসদ্ব্যবহারে ক্ষতির ইয়ত্তা থাকে না। আমরা প্রায় দ্রব্যমাত্রেরই অপব্যবহার করি সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হই। ইংরেজীশিক্ষা ও অনুকরণ প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার করিলে আমাদের নিশ্চয়ই উন্নতি হইত তাহাতে সন্দেহ নাই,—আমরা উহাদিগের যতটুকু সদ্ব্যবহার করিতেছি, আমাদের ততটুকু উন্নতিও হইতেছে। পক্ষান্তরে উহাদের অপব্যবহারের ফলও হাতে হাতে পাইতেছি। ফলতঃ দোষ আমাদের নিজের, অন্যের নহে।

প্রায় সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ এক সময়ে উন্নতির উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, একথা বোধ হয় এখন আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। সূক্ষ্মশিল্প সম্বন্ধে ভারতবাসী যে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন, তৎপ্রসূত কার্য্যের অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও এখনও যাহা কথঞ্চিৎ বিদ্যমান আছে, তাহা শিল্পজগতের 'সর্ব্বোচ্চ আদর্শ'। মিঃ হোন বলেন যে, ঐ সকল 'আদর্শের' আলোচনা ও অনুসরণ করা ব্যতীত, সূক্ষ্মশিল্পে উন্নতিলাভ করা দেশীয়দিগের পক্ষে কখনই সম্ভাবিত নহে। শিল্পশিক্ষার্থিগণ দেশীয় 'আদর্শ' অধ্যয়ন ও আলোচনা করুন অচিরাৎ ফললাভে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদের উদ্ভাবনীশক্তি স্বভাবতই 'জাগ্রত' হইবে। কেবল মাত্র বিদেশীয় 'আদর্শের' পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবাতেই তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না;

তদ্দ্বারা কেবল শক্তির অপচয় হইতেছে মাত্র। দেশীয় 'আদর্শের' প্রকৃতি তাঁহাদের সহজবোধ্য, আয়ত্তাধীন ও কল্পনার উত্তেজক হওয়ার অধিক সম্ভাবনা অতএব তাহারই অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

মিঃ হোন তাহার প্রবন্ধে আরও কয়েকটী কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ দেশের শিল্পশিক্ষার্থিগণ কিয়ৎ-পরিমাণেও গণিতশিক্ষা না করিয়া শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ইহা বড় আশ্চর্য্য। শিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রমাত্রেরই ব্যবহারিক জ্যামিতি, Practical Geometry ও Orthographical projection) শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা শিল্পে প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলাভ করা আদৌ অসম্ভব। মিঃ হোন গবর্ণমেণ্ট 'আর্টস্কুলের' শিক্ষাপ্রণালীর বড় পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু কলিকাতা 'রাইটার্স্ বিল্ডিং' নামক সৌধের 'টেবাকোটা' বিনির্ম্মিত কারুকার্য্যনিচয়ের উল্লেখ করিয়া রাজকীয় স্থপতিমহাশয়দিগের প্রতিও ইনি বিলক্ষণ কটাক্ষ করিয়াছেন। ইঁহার মতে প্রাগুক্ত 'টেবাকোটার' ব্যাপার, —শিল্পকার্য্য, যেরূপে সম্পাদিত না হওয়া উচিত, তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

আগামী বর্ষে বিলাতের 'টাইমস্' নামক দৈনিক সম্বাদপত্রের বয়ঃক্রম এক শতাব্দী হইবে। ১৭৮৫ সালে এই পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহার নাম 'ডেলিরেকর্ড' ছিল; ১৭৯১ সাল হইতে 'টাইমস্' নাম হইয়াছে। ১৮৫৮ সালে প্রতিদিন এই পত্রের ১৩,৭৮৫০০০ সংখ্যা বিক্রয় হইত। আজকাল 'কাটতি' অবশ্য আরও অধিক। 'টাইমস্' মুদ্রাঙ্কন করিতে যে কাগজ ব্যয়িত হয় তাহার পরিমাণ সপ্তাহে ৬০ টন অর্থাৎ ১৬৩৩ মন। এই কাগজরাশি সঙ্কলন করিতে ৪টা কাগজের কল অনবরত কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা মুদ্রণ জন্য ৪টী ষ্টিম প্রেস আছে। তাহাদের প্রত্যেকটীর বল দ্বাদশটী অশ্ববলের সহিত সমান। কালীর খরচ বাৎসরিক প্রায় লক্ষ টাকা। সংক্ষেপতঃ টাইমস্' সংবাদপত্ররূপী (নিদ্রাবিহীন) একটী কুম্ভকর্ণ।

১৮৮৪ সালের সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় অভিধান দৃষ্টে জানা গিয়াছে যে, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডে মোট ২০১৫ খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। নিজ লণ্ডন হইতে ৪০১ খানি, ওয়েল্স্ হইতে ৮০ খানি, স্কটল্যাণ্ড হইতে ১৮১ খানি, আয়র্ল্যাণ্ড হইতে ১৭৬ খানি এবং প্রদেশ সকল হইতে ১১৭৭।১৫ ৮ খানি সংবাদপত্র মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে নিজ বিলাতে ১৩৭ খানি, ওয়েল্সে ৪ খানি, স্কটল্যাণ্ডে ২২ খানি, আয়র্ল্যাণ্ডে ১৫ খানি সংবাদপত্র দৈনিক। কিন্তু গত ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডে মোট ৫৫১ খানি সংবাদ পত্র ছিল, ইহার মধ্যে ইংলণ্ডে ১২ খানি এবং আয়র্ল্যাণ্ডে ২ খানি সংবাদপত্র প্রত্যহ প্রকাশিত হইত। সুতরাং এই ৩৮বৎসরের মধ্যে এ সকল স্থানে সংবাদপত্রের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে বলিতে হইবে। পূর্ব্বে ১৮৭৬ সালে ১৪ খানি দৈনিক সংবাদপত্র ছিল, এক্ষণে ১৭৯ খানি বৃদ্ধি হইয়াছে। সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১২৬০; ইহার মধ্যে ৩৩২ খানি ধর্ম্মবিষয়ক। ভারতবাসীরা কবে বিলাতবাসিদের ন্যায় সংবাদপত্রের মর্য্যাদা করিতে শিখিবেন!!

পাক্ষিক সমালোচক।

প্রথম খণ্ড।] সন ১২৯১ সাল; বৈশাখ, দ্বিতীয় পক্ষ। [ষষ্ঠ সংখ্যা।

সমালোচনা ও সমালোচক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

কোন পদার্থের তত্ত্বাবগতিকেই সাধারণতঃ জ্ঞান (১) বলি। শৃঙ্খলা সম্পন্ন জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। 'জ্ঞান' প্রধানতঃ যেরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয় আমরা কিয়ৎ-পরিমাণে দেখাইয়াছি, এক্ষণ তাহার শৃঙ্খলা সম্পন্নতার বিষয় কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিব।

'জ্ঞান' কিরূপে শৃঙ্খলা-সম্পন্ন হয়? 'শ্রেণীবিভাগ' দ্বারা। শ্রেণী-বিভাগ-ক্রিয়া সাধারণতঃ কিরূপে সম্পাদিত হয়, দেখা যাউক।

পদার্থের সম্বন্ধপরম্পরার বিষয় আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, পার্থক্য হেতুই বস্তু বা ব্যক্তিমাত্রের স্বতন্ত্র বস্তুত্ব বা ব্যক্তিত্ব, আর পার্থক্যানুভূতি হইতেই জ্ঞানের প্রারম্ভ। অতঃপর বলা আবশ্যক যে, পার্থক্য, সাদৃশ্য ও পদার্থগত সমগ্র সম্বন্ধের উপলব্ধিই জ্ঞানের আপেক্ষিক পূর্ণতা। পার্থক্য হইতে পদার্থসমূহের স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু পার্থক্যসত্ত্বেও তাহাদিগের মধ্যে বহুবিধ সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যই প্রধানতঃ শ্রেণিসংগঠনের মূলভিত্তি।

কতকগুলি ধর্ম্ম বা স্বরূপের একত্রীভূত অবস্থিতির নাম পদার্থ। এই পদার্থের আবার প্রকারভেদ আছে, যেমন চেতন ও অচেতন। চেতন ও অচেতন মূলতঃ উভয়ই পদার্থ, কেননা উহারা উভয়ই একই প্রকৃতির কতকগুলি স্বরূপ বা ধর্ম্মের সমবায়ে সংগঠিত। কিন্তু চেতন পদার্থসমূহের মধ্যে একটী এমন ধর্ম্ম আছে যাহা অচেতন পদার্থে নাই এবং তাহা না থাকিবাতেই অচেতন পদার্থ চেতনপদার্থের শ্রেণিভুক্ত নহে, চৈতন্য বা জীবনবিশিষ্ট পদার্থমাত্রেই, অন্যান্য বহুবিধ পার্থক্যসত্ত্বে, চেতনপদার্থের অন্তর্ভূত; ইহার কারণ এই যে, চৈতন্য বা জীবন ইহাদিগের মধ্যে প্রবল সাদৃশ্য। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, বৃক্ষলতা গুল্ম—ইহারা সকলেই পরস্পরে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন; কিন্তু ইহাদের সকলেরই 'জীবন' আছে,

---

(১) জ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও জ্ঞান একই পদার্থ।

'জ্ঞান' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যথা,—'সাধারণ' ও বৈজ্ঞানিক' (Empirical or Experiential and Scientific)। বস্তুর বস্তুত্বমাত্রের যে জ্ঞান তাহা প্রথমোক্তের পরিচায়ক আর বস্তুগত সম্বন্ধজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান বলে। কিন্তু ফলতঃ কিয়ৎপরিমানে সম্বন্ধজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানমাত্রই অসম্ভব। বিজ্ঞানবিৎ হইতে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি পর্য্যন্ত এই নিয়মের অধীন। দিন—রাত্রি নয়, ও দুগ্ধ—জল নয়, এ জ্ঞান মূর্খদিগেরও আছে। কিন্তু সম্বন্ধবোধ ভিন্ন কি রূপে উক্ত জ্ঞান সম্ভব—প্রস্তাবের প্রথমাংশে আমরা এ বিষয়ের অংশতঃ আলোচনা করিয়াছি।

অথবা জীবনী শক্তি ইহাদের মধ্যে সাধারণ অর্থাৎ ইহাদের সকলেরই জন্মমৃত্যু ও হ্রাসবৃদ্ধি আছে। এই কারণে—এই সাদৃশ্য হেতুই—ইহারা মোটের উপর একটী সাধারণ শ্রেণীর অধীন। আর যাহাতে উক্ত সাদৃশ্য নাই, তাহা ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মবিশেষের সাদৃশ্য-বিদ্যমানতা ও সাদৃশ্যশূন্যতা হইতেই পদার্থসমূহের দুইটী প্রধান বিভাগ বা শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাদৃশ্যের আধিক্য ও সূক্ষ্মতা-অনুসারে এই বিভাগ বা শ্রেণী আরও বহুসংখ্যক বিভাগ ও শ্রেণীতে বিভাজ্য। যাহাদের জন্মমৃত্যু ও হ্রাসবৃদ্ধি আছে তাহারা সকলেই (মোটের উপর) একশ্রেণিভুক্ত। একটী জন্তুর ন্যায় একটী বৃক্ষেরও জন্মমৃত্যু ও হ্রাসবৃদ্ধি আছে, কিন্তু জন্তু একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করিতে পারে, বৃক্ষ তাহা পারে না, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে উভয়ের সাদৃশ্য নাই, অতএব বৃক্ষ চেতনপদার্থ হইয়াও জন্তু নয়। চেতনপদার্থের মধ্যে কতকগুলি একস্থান হইতে স্থানান্তরে স্বভাবতঃই গমনাগমন করিতে পারে আর কতকগুলি পারে না, অতএব এস্থলে চেতনপদার্থের আবার দুইটী বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহারা স্বভাবতঃ চলনক্ষম তাহারা একভাগে রহিল আর যাহারা চলৎশক্তিরহিত তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শ্রেণিভুক্ত করা হইল। চলনক্ষম চেতনপদার্থ জীব ও চলৎ-শক্তি-বিহীন চেতনপদার্থ উদ্ভিদ। বলা অনাবশ্যক যে, চেতনপদার্থের এ দুই বিভাগের প্রত্যেকেই আবার শতসহস্র ভাগবিভাগে বিভাজ্য।

সাদৃশ্যের নৈকট্য এবং দূরতাই প্রধানতঃ এই ভাগবিভাগের মূল কারণ এবং সাদৃশ্যের নৈকট্য ও দূরতা হইতেই শ্রেণিসংখ্যার আধিক্য এবং অল্পতা সংঘটিত হয়। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক।

'পদার্থ' এই সংজ্ঞাদ্বারা অবশ্য পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ বুঝায়, কিন্তু চেতনপদার্থ বলিলে পদার্থসমূহের মধ্যে কেবল সেই গুলিকে বুঝায় যাহাদের চৈতন্য আছে। পক্ষান্তরে 'জন্তু' এই সংজ্ঞাদ্বারা চেতনপদার্থের মধ্যে যাহারা চলনক্ষম কেবল তাহাদিগকেই বুঝায়। পরন্তু যখন 'মানবজাতি' বলি, তখন সমস্ত জন্তু বুঝায় না, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বুঝায়। মনুষ্যমাত্রকেই বুঝায়। মনুষ্যমাত্রই আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরস্পরে অনেক সদৃশ। এই কারণেই অবশ্য ইহারা সাধারণতঃ একজাতিবদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যেও অবশ্য সাদৃশ্যের তারতম্য আছে, সুতরাং তদনুসারে মনুষ্যজাতি আবার নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন ককেসীয়, মোগলীয়, ইথিওপীয় ইত্যাদি। গঙ্গাতীর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে ককেসীয় শ্রেণিভুক্ত মানবজাতির বাস। অতএব বিবেচনা কর, এই এক ককেসীয়দিগের মধ্যেই কতপ্রকার জাতি আছে। ইয়োরোপীয়, আসিরিক, পারসীয়, আরবীয়, ফিনিসীয়, ভারতীয় প্রভৃতি জাতি সাধারণতঃ ককেসীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত (১)। এই সকলের মধ্য হইতে ভারতীয় জাতি গ্রহণ কর। এই জাতির অন্তর্ভূত মানবমণ্ডলীর মধ্যেও আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের অবশ্যই স্বভাবতঃ তারতম্য আছে। সুতরাং তদনুসারে উহা বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতীয় জাতি যতভাগে বিভক্ত হইতে পারে তন্মধ্যে

(১) এস্থলে সংক্ষেপে একটা মোটামুটী রকম হিসাবে ধরা গিয়াছে।

বঙ্গদেশবাসি-মনুষ্যমণ্ডলী লইয়া একটী বিভাগ। এই বিভাগ আবার বহুশ্রেণীতে বিভক্ত। পরন্তু এক একটী শ্রেণীর মধ্যে আবার কতকগুলি করিয়া সম্প্রদায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কতকগুলি করিয়া পরিবার। প্রত্যেক পরিবারে যতগুলি লোক তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যের ন্যায় পার্থক্যও বিদ্যমান। সাদৃশ্য বা ঘনিষ্ট-সম্বন্ধনিবন্ধন ইহারা এক-পরিবারে বদ্ধ আর পার্থক্য হেতুই ইহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব।

এই দৃষ্টান্তটী বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, সাদৃশ্য ও পার্থক্যের আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে শ্রেণি-বিভাগের তারতম্য হয়। যে স্থলে সাদৃশ্য অল্প ও পার্থক্য অধিক সে স্থলে বহুসংখ্যক পদার্থ লইয়া একটী সাধারণ বা উচ্চ শ্রেণী, আর যে স্থলে সাদৃশ্য অধিক ও পার্থক্য অল্প সে স্থলে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পদার্থ লইয়া একটী বিশেষ বা নিম্নশ্রেণী গঠিত হয়। অপিচ নিম্ন শ্রেণী উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত ও উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ পদার্থসমূহের সংখ্যা অল্প।

পরন্তু উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যতই নিকট হইতে নিকটতর সাদৃশ্যের অনুসন্ধান করা যায়, ততই পদার্থ পরম্পরার সাধারণ বা উচ্চশ্রেণী হইতে বিশেষ বা নিম্নশ্রেণীতে অবরোহণ করিতে হয় এবং এই বিশেষ ও নিম্নশ্রেণী ক্রমশঃ বিশেষতর ও নিম্নতর হইতে থাকে।

অধিক হইতে অধিকতর এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সাদৃশ্যের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে নিম্ন এবং নিম্ন হইতে নিম্নতর শ্রেণিপরম্পরা অবরোহণ করিতে করিতে অবশেষে এমত স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় যেখানে শ্রেণিবিভাগ আর সম্ভাবিত নয়— যেখানে সকলই পৃথক পৃথক্।

একদিকে যেমন পদার্থপরম্পরার অত্যুচ্চ শ্রেণী হইতে অবরোহণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বনিম্নশ্রেণী বা শ্রেণিবিহীনতায় আইসা যায়, অপরদিকে তেমনি একটী দ্রব্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নতর হইতে উচ্চতর শ্রেণিসমূহ অতিক্রম করিতে করিতে শেষে শ্রেণিপরম্পরার সর্ব্বোচ্চশেখরে আরোহণ করা যাইতে পারে।

এইরূপ আরোহণ ও অবরোহণপ্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ বলে। বিভাগ বা বিয়োগ করা বিশ্লেষণের কার্য্য, আর সংযোগ বা সংগঠন করা সংশ্লেষণের কার্য্য। জ্ঞান ও বিজ্ঞানবিষয়ক যাবতীয় তত্ত্বানুসন্ধান বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ এই দুই উপায় দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য-কারণের সম্বন্ধানুভূতিই জ্ঞান। এই সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে একদিকে যেমন কার্য্য হইতে কারণ নিষ্কাসিত করা আবশ্যক অপরদিকে তেমনি কারণপরম্পরার সংযোগদ্বারা কার্য্য উৎপাদন করাও প্রয়োজন। কার্য্য হইতে কারণ নিষ্কাসিত করিতে হইলে বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা কার্য্যকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহার প্রত্যেক অংশের পরীক্ষা করিতে হয় আর যে স্থলে কারণ সংযোজন দ্বারা কার্য্য-উৎপাদন করা আবশ্যক সেইখানেই সংশ্লেষণপ্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সমালোচনার কর-যন্ত্রস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থের পরীক্ষার্থ ও শৃঙ্খলা-সংস্থাপন জন্য দুইটী উপায় মাত্র।

এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলিয়াছিলাম যে, সমালোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞান অসম্ভব।

এক্ষণ কিয়ৎপরিমাণে দেখাইয়াছি যে জ্ঞানের প্রাথমিক ও সাধারণ বিকাশ হইতে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম শ্রেণিবিভাগ পর্য্যন্ত সমস্তই সমালোচনার ফল। অপিচ সমালোচনা স্থলবিশেষে যেরূপে প্রযুজ্য তাহাও অংশতঃ আলোচনা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা হইতে সংক্ষেপতঃ ইহা বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে মনুষ্যমাত্রেই জ্ঞানের তারতম্যানুসারে কিয়ৎপরিমাণে সমালোচক। সামান্য কৃষক ও অসামান্য দার্শনিক উভয়েই স্ব স্ব জ্ঞাতব্যবিষয়ের সমালোচন করিতে বাধ্য। ফলতঃ সংসারে কে সমালোচক নয়? তুমি আমি, যে কেহ প্রাত্যহিক জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও ভালমন্দ নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য, সকলেই সমালোচক। তবে জ্ঞানের বিষীভূত পদার্থ ও জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে সমালোচনার ইতরবিশেষ হয়,—ইহা এক রূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এক জন সাধারণ লোকের সহিত এক জন দার্শনিকের বিভিন্নতা এই জন্য যে, দার্শনিকের সমালোচনা গভীর, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ এবং শৃঙ্খলাসম্পন্ন। তিনি দ্রব্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত না দেখিয়া নিরস্ত হন না। দ্রব্যমাত্রেই বিশ্লেষণদ্বারা তাহার প্রত্যেক অংশের পরীক্ষা ও সম্বন্ধপরম্পরার অনুসন্ধান করেন ও তাহাদিগের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া সাদৃশ্য ও পার্থক্যভেদে শ্রেণিবিভাগ করেন। পক্ষান্তরে একজন সাধারণ লোকেরও তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থপুঞ্জে কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ লক্ষণ নির্ণয় ও শ্রেণিবিভাগ করিতে হয়। কিন্তু সচরাচর তাঁহার দৃষ্টি স্থূল ও অদূরগামী, সুতরাং সমগ্র দ্রব্যে তাঁহার জ্ঞান জন্মে না, দ্রব্যের কিয়দংশের স্থূল স্থূল লক্ষণ জানিয়াই তিনি নিরস্ত হন। ভালমন্দের, কার্য্যাকার্য্যের একটা মোটামুটী বিভাগ করিয়া লয়েন। আর বৈজ্ঞানিক উক্ত কার্য্য বিস্তারিত ও বিষদরূপে এবং শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করেন।

যাহা হউক এই লক্ষণনির্ণয় ও শ্রেণিবিভাগের উপরেই মনুষ্যের যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রধানতঃ অবস্থিত। ঐ দুই কার্য্যসম্পাদনে যিনি যে পরিমানে পটু, তিনি সেই পরিমানে জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক। তবে কার্য্য দুইটীর সুসম্পাদন বড় সহজ নহে। স্বয়ং প্লেতো বলিয়াছিলেন যে, যিনি লক্ষণনির্ণয় ও শ্রেণিবিভাগ করিতে সম্যকরূপে সুপারক তিনি দেবতাসরূপ। "That he is to be held as a God who knows perfectly how to define and devide."(1)

(ক্রমশঃ)

ঃ—

(1) Novum Organum—by Lord Bacon.

বেদান্ত পরিভাষা।

ভূমিকা।

নাস্তিক ও আস্তিক উভয় পক্ষের প্রত্যেকের ছয়টী করিয়া দর্শন;—একপক্ষে ঈশ্বরে জগৎকর্ত্তৃত্বাদি-খণ্ডনের যুক্তি, অপর পক্ষে তাহা প্রতিপাদনের ব্যবস্থা। নাস্তিকতামতে শূন্যবাদী মাধ্যমিক, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচার, জ্ঞানাকারানুমেয়-ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদী সৌত্রান্তিক, ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদী বৈভাষিক, দেহার্থবাদী চার্ব্বাক্, এবং দেহাতিরিক্ত-দেহ-পরিণামবাদী দিগম্বর সিদ্ধান্ত—এই ছয় দার্শনিক *। ইঁহাদিগের সিদ্ধান্তানুসারে অহিংসাই পরমধর্ম্ম, শরীরপীড়নই পাপ, অভিলষিত বস্তুর উপভোগই স্বর্গ এবং অপরাধীনতাই মুক্তি। এই পাঞ্চভৌতিক দেহপতনের পর প্রাণিগণের আর পুনর্জ্জন্ম নাই। স্বভাব হইতেই প্রত্যেক পদার্থের উৎপত্তি ও স্বভাবেই তাহার বিলয়, —ধারাবাহিক জগতের অপর কেহ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী নাই। শরীরই একমাত্র সুখদুঃখের আশ্রয়,অতিরিক্ত চৈতন্যরূপ আত্মাও অলীক। সেইরূপ আস্তিকতামতে, ন্যায়প্রণেতা গৌতম, বৈশেষিককর্ত্তা কণাদ, সাংখ্যপ্রণেতা কপিল, পাতঞ্জল-কারী পতঞ্জলি, মীমাংসাকারক জৈমিনি এবং বেদান্তপ্রণেতা ব্যাস—এই ষড়্দার্শনিক। বিশুদ্ধ ব্রহ্মপ্রতিপাদনই ইঁহাদিগের দর্শনের তাৎপর্য্য; তবে যুক্তি ভেদে মার্গসকল পৃথকমাত্র।

এস্থলে আস্তিক দর্শনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

১।২। ন্যায় ও বৈশেষিকমতে, জগদীশ্বর, প্রাণিদিগের অদৃষ্টানুসারে পরমাণুকে সৃষ্টির প্রাক্কালে উপাদান করিয়া, দিক্কালসহকারে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয় করিতেছেন। প্রাণিসকল স্বকীয় অদৃষ্টবলে পৃথক্ পৃথক্ সুখদুঃখ ভোগ করিয়া, যাবতীয় পদার্থের যথার্থ বিচারোৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক রূপে জ্ঞাত হইয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে, দেহাভিমানী, সুখদুঃখাদির আশ্রয় জীবসকল পরস্পর বিভিন্ন, আর সর্ব্বভূতের আশ্রয় জগৎকর্ত্তা পূর্ণ পরমাত্মা কেবল একমাত্র।

৩। সাংখ্যমতে, পদ্মপত্রগত জলের *ন্যায় নির্লিপ্ত, জগতের জন্মাদির অনাশ্রয়*, পুরুষ, জ্ঞানের আশ্রয়হেতু সুখদুঃখভোগী ও সাক্ষিরূপে সকলের দ্রষ্টা এরূপ পুরুষের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া,সম-সত্ত্ব রজঃ-তম-গুণযুক্তা প্রকৃতি এই জগতের সমুদায় পদার্থ প্রসব করিতেছেন। সুখদুঃখাদিভোগের বিভিন্নভাবশতঃ পুরুষের ভেদ হয় এবং পুরুষের বিভিন্নতাপ্রযুক্ত তদীয় প্রকৃতিও ভিন্ন হয়। নির্লিপ্ত পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গে আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসারে ত্রিতাপগ্রস্ত † হন। বেদোক্ত হিংসাজনক যাগাদিক্রিয়াসকলও তাঁহার সংসারে বদ্ধ হইবার অন্যতম কারণ। বুদ্ধি-

* প্রথমোক্ত চারি দর্শন বৌদ্ধমতাবলম্বী এবং দিগম্বর সিদ্ধান্ত জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

† দুঃখ ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দ্বিবিধ—শারীরও মানস।

বৃত্তিপরিচালনের দ্বারা সকল পদার্থ বিচার করিয়া প্রথমতঃ প্রকৃতিকে বিনাশ করিতে হইবে। প্রকৃতি বিনষ্ট হইলে পুরুষ পূর্ব্ববৎ জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হইয়া, 'আমার সুখ-দুঃখাদি কিছুই নহে' এইরূপ বিবেকদ্বারা অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া, আধিদৈবিক, অধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—এই তাপত্রয় হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

৪। পাতঞ্জলমতে চিত্তকে বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া অন্তর্বাভিনিবেশরূপ চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই যোগ। ইহাই জীবের একমাত্র কৈবল্যপ্রদ। ক্ষিপ্ততা, মূঢ়তা, বিক্ষিপ্ততা, একাগ্রতা ও নিরুদ্ধতা-ভেদে চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থা।

(ক) রজোগুণের উদ্রেকদ্বারা চিত্ত অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া যে সময়ে সুখাদি সাধনবিষয়ে প্রেরিত হয়, তাহার নাম **ক্ষিপ্তাবস্থা**। তদবস্থা, সর্ব্বদা দৈত্যগণের ও সময়বিশেষে মনুষ্যদিগেরও হইয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যে মহাভারতপ্রকীর্ত্তিত দুর্য্যোধনের অবস্থা ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গীতাতে এই অবস্থা 'আসুরীভাব' বলিয়া কথিত হইয়াছে; যথা—

"দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানঞ্চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীং॥"*

(খ) তমোগুণের উদ্রেকদ্বারা ক্রোধাদির বশতাপন্ন হইয়া, চিত্ত যখন নিরন্তর পরের উপতাপাদিরূপ বিরুদ্ধকার্য্যদ্বারা কেবল দুঃখসাধন বিষয়ে নিরত হয়, তখন তাহার **মূঢ়াবস্থা**। তদবস্থা সর্ব্বদা কার্য্যাকার্য্যবিচারণে অক্ষম, রাক্ষস, পিশাচ ও মহিষাদি বন্যপশুরই ঐরূপ প্রকৃতি সর্ব্বদা লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থাপন্ন লোক সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-সম্ভোগকর-বিষয়-লোলুপ, নিতান্ত নির্লজ্জ, এবং বিষয়তৃষ্ণায় অনুক্ষণ ব্যাকুল। ভাগবতে কীর্ত্তিত কংস এই অবস্থার দাস।

(গ) সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে ক্ষমা, শান্তি, দয়াদিদ্বারা বিভূষিত হইয়া যে সময়ে চিত্ত ক্লেশাদিসাধনবিষয়ে বিরতিপূর্ব্বক কেবল বিশুদ্ধ আনন্দ বিধান করে ও রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দপ্রভৃতি বিষয়ে নিরত হয়, সেই সময়ের নাম **বিক্ষিপ্তাবস্থা**। তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সাধুসমাজবেষ্টিত হইয়া অনুদ্বিগ্নমনাঃ ও অদীনভাবে নিরন্তর ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য ব্যাকুল হয়, বেদবিধানানুসারে ধর্ম্মোপার্জ্জন মানসে ব্রাহ্মণ গো প্রভৃতিতে উদারচিত্ত ও দীনজনের প্রতি কৃপাপরতন্ত্র হয় এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার পুণ্যকর্ম্মে তৎপর থাকে। এরূপ অবস্থা কেবল দেবভাগণের ও দেবভাবাপন্ন মনুষ্যগণেরই হইয়া থাকে, এরূপ অবস্থাপন্ন মনুষ্যের মধ্যে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই সর্ব্বপ্রধান।

(ঘ) তমোগুণ দূরীভূত হইয়া কেবল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক দ্বারা যে সময় চিত্ত কেবল ঈশ্বরে একতান হয়, তাহার নাম **একাগ্রাবস্থা**।

(ঙ) এবং যখন সংস্কারের সহিত চিত্তের সকল বৃত্তি নির্ম্মূল হয়, তখন তাহার **নিরুদ্ধাবস্থা**।

প্রথমোক্ত অবস্থাত্রয় যোগের অনুপযোগী বলিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। শেষোক্ত অবস্থাদ্বয়ই যোগের উপযোগী এবং তাহা কেবল বৈরাগ্য ও অভ্যাসদ্বারা সম্পন্ন হয়। যথা,

* ১৬ অধ্যায়, ৪ শ্লোক।

"অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

(ক) যোগসাধনোপায়ের বারম্বার অনুষ্ঠানের নাম অভ্যাস। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাভেদে তাহার পঞ্চবিধ উপায়। যোগবিষয়ে চিত্তের প্রসাদরূপ শ্রদ্ধা হইতে উৎসাহ উৎপন্ন হয়, সেই উৎসাহের নাম বীর্য্য; বীর্য্যদ্বারা পূর্ব্বানুভূত বস্তুসকল স্মরণ হয়, তাহাকেই স্মৃতি বলে; ঐ স্মৃতি হইতে একাগ্রতারূপ সমাধি, এবং সেই সমাধি হইতে জ্ঞাতব্য আত্মবিবেকরূপ প্রজ্ঞা জন্মে।

(খ) ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত বিষয়সকলকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় তুচ্ছ করিয়া পরিত্যাগ করার নাম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য বস্তুর দোষবিচারদ্বারা উৎপন্ন হয়।

যোগের অপর অষ্টপ্রকার অঙ্গ আছে; যথা,— যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। এইরূপ যোগের দ্বারা অহিংসা প্রভৃতি অভ্যাস করিলে যোগিগণ অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন হন। অভ্যাসানুসারে যোগের যাহা প্রধান প্রধান ফল তাহাই মাত্র এস্থলে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করা যাইতেছে।

(১) অহিংসা অভ্যাস করিলে, অর্থাৎ সর্ব্বভূতের প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইলে, সহজবিরোধী অহিনকুলাদিও পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া একত্রে নিকটে বাস করে। প্রাচীন ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, আর্য্যঋষিদিগের আশ্রমভূমিতে মৃগ ও ব্যাঘ্র একত্র বাস করিত। ইহা বিচিত্র বা অসম্ভব নহে; প্রত্যুত, ইহা অহিংসা-অভ্যাসের ফলমাত্র।

(২) সত্য অভ্যাস করিলে কৃত কার্য্যের ফল অচিরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যে মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার চেষ্টা কদাপি নিষ্ফল হয় না। পুরাকালিক মুনিঋষিরা যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতাতিক্রম, অগাধ সমুদ্রশোষণ, সজীবপদার্থ ভস্মাবশেষকরণ প্রভৃতি অলৌকিক ও অসাধ্য কার্য্যসাধন করিতেন, একমাত্র সত্যাভ্যাসই তাহার প্রধান কারণ।

(৩) অস্তেয় অভ্যাস করিলে, অর্থাৎ অন্যের বস্তু-অপহরণের ইচ্ছা একবারে নিবৃত্ত হইলে, জগতের যাবতীয় রত্নাদি সুখকর সামগ্রী যোগীকে আশ্রয় করে। কল্পতরু কামদুঘা প্রভৃতি অভীষ্টফলপ্রদ সামগ্রী এইরূপেই যোগিগণের আশ্রয়ীভূত হইত।

(৪) ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস দ্বারা বীর্য্যবৃদ্ধি হয়। সত্যাভ্যাস-ফলস্বরূপ চেষ্টায় কৃতকার্য্যতার সহিত এই বীর্য্যফলের নিত্যসম্বন্ধ।

(৫) অপরিগ্রহ অভ্যাস করিলে জন্মান্তর স্মরণ হয়। জন্মান্তর স্মরণ হইলে পূর্ব্বপরিভ্রান্ত যোনিতে অনুভূতবিষয়সকল সহজেই মনোমধ্যে উদয় হয় এবং তাৎকালিক প্রাণিবর্গের ভাষা ইঙ্গিত প্রভৃতি বিষয়সকল অনায়াসে অবগত হইতে পারা যায়।

(৬) শৌচ অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়।

(৭) সন্তোষদ্বারা নিরন্তর সুখলাভ হয়।

(৮) তপস্যাদ্বারা কায়া ও ইন্দ্রিয়াদির শুদ্ধি হয়। দেহ শুদ্ধ হইলে ইচ্ছাক্রমে সেই দেহের হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হইলে অতিদূরস্থিত সূক্ষ্মতম বস্তুসকল অনায়াসে দেখিতে পাওয়া যায় এবং অপরের শরীরে প্রবেশ করিবার শক্তি জন্মে।

(৯) জপাভ্যাস দ্বারা আত্মাধ্যদেবদর্শন

যোগসূত্র। সমাধিপাদ। ১৩ সূত্র।

হয়। তদ্দ্বারা আন্তরিক ক্লেশাপনয়নপূর্ব্বক সমাধিলাভ হয় এবং সেই সমাধিবলে শীতোষ্ণজনিত ক্ষুৎপিপাসাদি বৃত্তিসমূহ একবারে বিদূরিত হয়।

এইরূপ নিরন্তর যোগাভ্যাস দ্বারা যোগিগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি রোধ করিয়া অন্তর্বৃত্তিদ্বারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাতে রমণ করতঃ কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই যোগের চরম ফল। কিন্তু এরূপ যোগাভ্যাসের জন্য চিত্তশুদ্ধিই সর্ব্বপ্রধান উপাদান, কারণ চিত্তের প্রশস্ত্য-অপ্রাশস্ত্য-অনুসারে স্বর্গকে নরক জ্ঞান হয় এবং নরককেও স্বর্গজ্ঞান জন্মে,* এই কারণেই যোগীরা চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫। মীমাংসকমতে ঈশ্বর এই অনাদি জগতের সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ নহেন, জগৎ স্বয়ংই স্বকীয় কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখগ্রস্ত হইয়া চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

মহামহোপাধ্যায় শালিকনাথমিশ্রও শাস্ত্রিশতকের মঙ্গলাচরণে সেই কর্ম্মকে অভিবাদন করিয়াছেন—

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মেভ্যোবিধিরপি ন যেভ্যঃপ্রভবতি॥"

[আমরা কাহাকে প্রণামকরিব?—বলিবে দেবতাগণকে; কিন্তু দেবতাগণ বিধাতার বশীভূত, তাঁহাদের স্বকীয় কোন ক্ষমতা নাই, অতএব বলিতে পার, বিধাতাকেই প্রণাম কর; কিন্তু বিধিও কেবল একমাত্র কর্ম্মফলই প্রদান করেন, ঐ ফল কর্ম্মের অধীন, ইহাতে অমরগণ বা বিধাতা কি করিবেন?— অতএব কর্ম্মই আমাদের প্রণম্য, যাহার উপর বিধাতারও কোন প্রভুত্ব নাই।]

বেদোক্ত অশ্বমেধাদি যজ্ঞের নাম কর্ম্ম। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম হইতে সঞ্চিত হইয়া ফলপ্রদ হয়। এই জগতে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফল, এবং ফল হইতে পুনর্ব্বার বীজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কর্ম্ম হইতে জগৎ এবং জগৎ হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এতদুভয়ের আদি কে— সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই কারণেই মহর্ষিগণকর্ত্তৃক এই জগৎ চক্রের ন্যায় পরিভ্রাম্যমান গোলাকার পদার্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যজ্ঞাদিকার্য্যে আহুতিভাক্ মন্ত্রময় দেবতা; মন্ত্র হইতে দেবতা পৃথক্ নহে। মন্ত্ররূপ দেবতাবাচক শব্দময় বেদনিত্য, কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই, ইহা অপৌরুষেয়। বেদের মধ্যে 'স্বর্গকামী অশ্বমেধেন যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্যই প্রামাণ্য; আর 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি ঈশ্বরে-জগৎ কর্ত্তৃত্বাদিপ্রতিপাদক শ্রুতিসকল অর্থবাদ বাক্যমাত্র। পরন্তু রাজসূয়প্রভৃতি যজ্ঞাদিদ্বারা স্বর্গলাভই পরম পুরুষার্থ।

৬। বেদান্তমতে স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মনিরূপণই বেদান্তশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। সত্যই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ; তথাচ শ্রুতিঃ—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম…"

পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে সূক্ষ্মজ্ঞানরূপে জগৎ-

---

*"The mind is its own, and in itself
Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven."
Milton., P. L. (I.)

দের বৈচিত্র্যহেতু প্রাণিদিগের কর্ম্ম ও অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট মায়ার সহিত একত্রিত হইয়া, এবং নাম-রূপাত্মক নিখিল প্রপঞ্চকে প্রথমতঃ স্বীয় বুদ্ধিতে সঙ্কলন করিয়া, 'আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করেন। তথাচ শ্রুতি:—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়"

পরে আত্ম হইতে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশাদি পঞ্চমহাভূত ও তন্মাত্ররূপপ্রতিপাদ্য শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ উৎপন্ন করেন। তৎপরে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের অংশ পরস্পর মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত* স্থূল পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ভূম্যাদি চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ ব্রহ্মাণ্ড ও জরায়ুজ প্রভৃতি চতুর্বিধ স্থূলশরীরের উৎপত্তি হয়। প্রলয়সময়ে নিখিল প্রাণিগণের কর্ম্মাবসানে, এই জগৎ ক্রমশঃ সৃষ্টিক্রমের বিপরীতক্রমে‡ পরস্পর লীন হইয়া পুনর্ব্বার ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

জীবগণ করুণাময় গুরুর কৃপায় বেদান্ত শাস্ত্র হইতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানলাভ করিয়া পরমানন্দময় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। এই সংসারে ইহাই একমাত্র পরম পুরুষার্থ ও বেদান্ত শাস্ত্রের পরম প্রয়োজন।

---

*"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ-পঞ্চতে ॥"
ইতি পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক। ২৭ শ্লোক।

† ভূমি, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, মহ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত উর্দ্ধলোক। অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল—এই সপ্ত অধোলোক।

‡ লয়ের ক্রম। পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ জীবাহঙ্কারে, জীবাহঙ্কার হিরন্যগর্ভাহঙ্কারে ও হিরন্যগর্ভাহঙ্কার অবিদ্যা অর্থাৎ মায়াতে লয় হয়।

প্রস্ফুটিত বিমলভাবৎ আপাতমনোহর কামাকর্ম্মদ্বারা মনুষ্যাদিগকে ঘোর সংসারে মুগ্ধ দেখিয়া, তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য পরম কারুণিক মহর্ষি বেদব্যাস সমস্তশাস্ত্রের সহিত সমন্বয় করিয়া এই বেদান্ত শাস্ত্রের মূল শারীরিকসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

কালের অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে অধুনা ঐ বেদান্তশাস্ত্র লোকের দুরধিগম্য হইয়া উঠিয়াছে। আজি কালি পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী অনেকেই ব্রহ্মবাদী বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্ম কি পদার্থ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মই বা কি তাহা অনেকেই একবারে অপরিজ্ঞাত। তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া অনেকস্থলে যথেচ্ছাচারিতা ও ব্যাহ্যাড়ম্বর প্রকাশ করেন। মূলশাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় রচিত এবং আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই তাহাতে অনভিজ্ঞ ও সাধারণতঃ অল্পদর্শী, সুতরাং তাহারা শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। স্বকপোলকল্পিত অর্থ করিয়া তাঁহারা শাস্ত্রের বিপর্য্যয়সাধন ও অবমাননা করেন মাত্র। অধুনা বঙ্গে অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে আর্য্য সনাতনধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়া ও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রত্যেক শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের হৃদয়ঙ্গম হওয়া সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। কিন্তু যতদিন না শাস্ত্রার্থসকল বঙ্গভাষায় বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে, ততদিন উহা কার্য্যে পরিণত হওয়া বিষয়ে অল্পই আশা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বেদান্ত-শাস্ত্রের সারমর্ম্ম ক্রমশঃ বিবৃত করিব।

শ্রীনবচন্দ্র শর্ম্মা।

ভারতীয় শিক্ষাপ্রণালী।

ভারতবর্ষে কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য—এ সম্বন্ধে বহুকালাবধি নানাবিধ সংবাদ ও সাময়িকপত্রে বাদানুবাদ হইয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে স্বল্পবয়সে বালকগণের মস্তিষ্ক গুরুভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে সুতরাং ভবিষ্যৎ কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদিগের কার্য্যকারিতাশক্তি সম্যক প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। কেহ বলিয়াছেন, সারবান ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের পরিবর্ত্তে অসার ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বালকগণের সর্ব্বনাশসাধন করিতেছেন। কেহ বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, কেহ বা শারীরিক শক্তিবৃদ্ধির পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। কাহারও মতে জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, কেহ বা ধনোপার্জ্জনই শিক্ষার একমাত্র নিদান মনে করিয়াছেন। এই বিভিন্নমার্গানুসারী ব্যক্তিগণমধ্যে কাহার মত সত্য, তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কিন্তু প্রতিবাদের ভয় না করিয়া ইহা অক্ষুব্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, প্রাগুক্ত সকলমতেই আংশিকরূপে সত্য নিহিত আছে। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী ও পরীক্ষাগ্রহণপদ্ধতিদর্শনে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়া থাকেন।

কোন বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ের অভাব ও আবশ্যকতা অনুভব করা কর্ত্তব্য। যাহার যে বিষয়ের অভাব ও আবশ্যকতা, তাহাকে সেই বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা উচিত। অন্যথা হরবোলার মত কতকগুলি কথা কণ্ঠস্থ করিয়া বাপায় কোনও ফল নাই। মনেকর, তণ্ডুল আমাদের প্রধান খাদ্য। তণ্ডুল না হইলে আমরা দুইদিন নিশ্চিন্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি না। দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ভূমি রহিয়াছে, কিন্তু দেশীয় লোক অজ্ঞতাবশতঃ কেমন করিয়া তণ্ডুল উৎপাদন করিতে পারে না। এমত অবস্থায় আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে অপরাপর বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কিরূপে তণ্ডুল উৎপাদন করা যাইতে পারে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ এবং তদ্বিষয় শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু আমাদিগের পক্ষে তণ্ডুলের অভাব ও আবশ্যকতা উভয়ই এত অধিক পরিমাণে রহিয়াছে যে, আর কিছুই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ তণ্ডুলের পর দাল, লবণ, তৈল, মৎস্য, মাংস পরিধেয় ইত্যাদির অভাব ও আবশ্যকতা অনুসারে তত্তদ্বিষয় সংগ্রহ ও তাহাদের নির্ম্মাণকৌশল শিক্ষা করা প্রয়োজন। অভাব ও আবশ্যকতা হইলে সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত ও সংগ্রহ কৌশল শিক্ষার যেরূপ প্রয়োজন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়শিক্ষারও সেইরূপ প্রয়োজন। অতি প্রাচীনকালে যখন মনুষ্যজাতি নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় কালযাপন করিত, তখন তাহাদিগের কেবলমাত্র স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টি ছিল। তাহারা আপন শরীররক্ষার্থ বৃক্ষফলাহরণ ও বন্যজন্তুনিহনন করিত। তাহার পর যখন ক্রমে তাহারা পরস্পরের অভাব দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ-সূত্রে বদ্ধ হইল, তখন হইতে

তাহাদিগকে আত্মশরীর অপেক্ষা পরকীয় শরীরের প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইল এবং স্বল্পায়াসে গুরুতর মানসিক কার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এইরূপে সমাজ যতই উন্নত হইতে লাগিল, ততই নূতন নূতন অভাব ও আবশ্যকতার সৃষ্টি হইতে লাগিল। মনুষ্যজাতিও স্ব স্ব অভাব এবং আবশ্যকতা-অনুসারে প্রকৃতির নিকট শিক্ষালাভ করিয়া জগতের উন্নতিবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে প্রাচীন ভারত, প্রাচীন মিসর, প্রাচীন গ্রীশ, প্রাচীন রোম এবং আধুনিক আমেরিকা, জর্ম্মণি, ফ্রান্স ইংলণ্ড ও সুইজর্লণ্ড স্ব স্ব উন্নতিসাধন করিয়াছেন। যে জাতি যত অধিক পরিমাণে আপনাদিগের অভাব ও আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, সেইজাতি জগতে সেই পরিমাণে আপনার উন্নতির ধ্বজা রাখিয়া যাইতেছেন। আজি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উন্নত; ভারতবর্ষ অবনত। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আর কিছুই নহে। ভারতবাসী একসময়ে উন্নত হইয়া মনে করিয়াছিল, আমাদিগের যাবতীয় অভাব ও আবশ্যকতা তিরোহিত হইয়াছে, জগতে আমাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, সুতরাং আমাদিগের আর কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। এইরূপে নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম অবস্থায় নিপতিত হওয়াতে তাঁহারা সুদূর-দেশবাসী বিজাতীয় বিভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত মুষল-মানগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন এবং মুষলমানগণও এইরূপ নিরুদ্যম ও বিলাসী হইয়াছিল বলিয়াই আজি পঁচিশ কোটী ভারতবাসী ইংরেজের পদানত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ইংরেজ ও মার্কিনজাতি যতই উন্নতিলাভ করিতেছেন, ততই প্রবলরূপে তাঁহাদিগের উন্নতির ইচ্ছা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাঁহারা দিন দিন নূতন নূতন অভাব ও আবশ্যকতা আবিষ্কার করিয়া আপনাদিগের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে জাতি যত অভাব ও আবশ্যকতা অনুভব করিবে, সেইজাতি জগতে তত উন্নত ও সভ্য হইবে। বর্ত্তমান ভারতে কীদৃশ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য, নিরূপণ করিতে হইলে দেখা আব-শ্যক, ভারতবাসীর কি কি বিষয়ে অভাব ও আবশ্যকতা আছে। এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য যে, বর্ত্তমান অভাব ও আবশ্যকতা দূরীভূত না করিয়া ভবিষ্যৎ অভাব ও আবশ্যকতা দূরীকরণে যত্নশীল হইলে নিশ্চয়ই কোন ফল হইবে না। এবং এরূপ অনৈসর্গিক উপায় অবলম্বন করিলে অচিরে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইবে।

যিনিই অভিনিবেশসহকারে ভারতবাসীর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন, ভারতবাসী শারিরীক ও মানসিক উভয়বিধ বলেই দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতে-ছেন। সপ্তশতবর্ষ পরাধীন থাকিয়া ভারত-বাসী স্বীয় বলবীর্য্য সমস্ত হারাইয়াছেন। সে তেজ, সে প্রতিভা বহুদিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছে। কালস্রোতে ভারতের শৌর্য্যবীর্য্য সমস্তই লোপ পাইয়াছে। ভারতবাসী এখন "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ"। কি জন্য ভারতসন্তান এই শোচনীয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া-ছেন, জানিতে চাহিলে তাহার একমাত্র কারণ পরাধীনতা বই আর কিছুই উপলব্ধি হয় না। বিদেশবাসীর পদানত হইয়া ভারত-বাসী আজ আপনার অভাব ও আবশ্যকতা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং ভারতবাসীর দিন দিন অধোগতিই সাধিত হইতেছে। তাঁহার যখন যে কোন